ভুল

ইমদাদুল হক মিলন

ভুল ● ইমদাদুল হক মিলন

brommochari@yahoo.com
mayakanon@hotmail.com
silkilasilki@gmail.com

অন্যপ্রকাশ প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই
অপরিচিতা
মন ছুঁয়ে যায় ভালবাসা
স্বপ্ন
বহুদূর
হে বন্ধু হে প্রিয়
ভালবাসার নির্বাচিত উপন্যাস সেট
তোমার আমার ভালবাসা

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছ।

❐ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূত দেখার মতো চমকালেন আরজু। পর্দার মাঝখানে কার মুখ! শরীর দেখা যায় না, শুধু মুখখানি!

বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে বই পড়ছেন বলে চোখের চশমা নাকের ডগায় এসে নেমেছে আরজুর। চশমাটা চোখের দিকে ঠেলে দিয়ে উঠে বসলেন তিনি। তখুনি পর্দার মাঝখানকার মুখটিকে নিঃশব্দে হাসতে দেখলেন। আরজু একটা হাঁপ ছাড়লেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, তুমি এ সময়?

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন হায়াত সাহেব। তাঁর বিশাল মোটা দেহের ছায়া পড়ল ঘরে। আরজুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, গভীর রাতে বার থেকে মদ খেয়ে বেরিয়েছে দুই মাতাল। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বলল, তুমি যে রাতের বেলা এত দেরি করে ফের তোমার স্ত্রী তোমাকে কিছু বলেন না? দ্বিতীয় মাতাল বলল, কি করে বলবেন, আমার তো স্ত্রীই নেই! আমি বিয়েই করিনি। শুনে প্রথম মাতাল একেবারে হকচকিয়ে গেল। তার নেশা প্রায় ছুটে যায় যায় অবস্থা। তীক্ষ্ণ চোখে দ্বিতীয় মাতালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে তুমি এত দেরি করে বাড়ি ফের কেন?

জোক বলে নিজে কখনও হাসেন না হায়াত সাহেব। হাসে অন্যেরা। হায়াত সাহেব যান গম্ভীর হয়ে। এখনও হলেন। গম্ভীর মুখে বিছানায় স্ত্রীর পাশে বসলেন। তারপর গল্পের প্রথম মাতালের মতো তীক্ষ্ণ চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তুমি যে হাসলে না?

আরজু নির্বিকার গলায় বললেন, হাসি পায়নি।

কেন জোকটা কি খুব খারাপ ছিল?

তা তো ছিলই। আমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। আমি প্রথম মাতালের স্ত্রী নই যে আমার ভয়ে বারে বসে মদ খেয়ে সময় কাটাতে হবে তোমার। বার বন্ধ হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরতে চাইবে না।

হায়াত সাহেব বেশ শব্দ করে হাসলেন। না মানে আমাকে দেখে খুবই অবাক হলে কিনা

এজন্য জোকটা বললাম।

অবাক হব না? তুমি কি এ সময় কখনও বাড়ি ফের? তাছাড়া আমি পড়ছি বই হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ফুটবলের মতো একটা মুখ। হাত পা শরীর কিছু নেই। শুধু মুখ। প্রথমে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।

ভয় না, আমি তোমাকে একটু চমকে দিতে চেয়েছিলাম। এজন্য অমন করেছি। তাছাড়া এই দেহ নিয়ে তিন তলায় ওঠা, বোঝই তো। জানটা বেরিয়ে যায়। ওভাবে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম।

কিন্তু তুমি এলে গাড়ির শব্দ যে পেলাম না!
গাড়ি নিয়ে আসিনি। স্কুটারে এলাম। গাড়ি গেছে তুলিকে আনতে।
এভাবে স্কুটার নিয়ে বাড়ি চলে আসার মতো কি এমন জরুরি ব্যাপার হল?
হয়েছে একটা। বলছি। জামা কাপড় ছেড়ে নিই।
ফুল হাতা শার্টের হাতার বোতাম খুলতে লাগলেন হায়াত সাহেব।
আরজু বললেন, তার মানে তুমি আজ আর বেরুচ্ছ না?
কোথায় বেরুব?
তোমার কি বেরুবার জায়গার অভাব আছে?
তা কিন্তু আছে! বেরুবার জায়গার অভাব কিন্তু আমার আছে। অফিস ছাড়া আমার আসলে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।
ওরকম অফিস থাকলে যাওয়ার জায়গা থাকবে কি করে! সকাল সাতটা আটটায় বেরিয়ে যে অফিস থেকে রাত দশটা বারোটায় বাড়ি ফিরতে হয় ওরকম একখানা অফিসই যথেষ্ট। যাওয়ার জায়গার আর দরকারই বা কি!
শার্টের বোতাম খোলার পর হাসফাস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন হায়াত সাহেব। শার্টটা খুলে বিছানায় ফেললেন। এমনিতেই কুচকুচে কালো গায়ের রঙ তাঁর, তার ওপর বেজায় মোটা, ভুড়িটি বিশাল, শার্ট খুলবার পর তাঁকে যেন আরও বেশি মোটা লাগছে। এক পলক স্বামীর দিকে তাকিয়ে বইয়ের যে পৃষ্ঠা পড়ছিলেন সেই পৃষ্ঠার কোণা ভেঙে ভাজ করলেন আরজু। বইটা বন্ধ করে বালিশের পাশে রেখে বিছানা থেকে নামলেন।
তোমার ভুড়ি আজ আরও বিশাল দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি?
আলনা থেকে একটা লুঙ্গি নিলেন হায়াত সাহেব। আজ একটা ভুড়ি ভোজ হয়েছে, এজন্যে।
তার মানে দুপুরে বিরানি ফিরানি খেয়েছ!
না না বিরানি নয়, ভাত। তবে একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি।
বিছানার ওপর ফেলে রাখা হায়াত সাহেবের শার্টটি তুলে আলনায় রাখতে রাখতে আরজু বললেন, ভাত পেলে কোথায়? তোমার লাঞ্চ বক্সে ভিজিটেবল আর আটা রুটি দেয়া হয়েছে।
কোমরের ওপর লুঙ্গি গিট দিয়ে প্যান্ট ইত্যাদি নিজেই আলনায় তুলে রাখলেন হায়াত সাহেব। তারপর বিছানার উল্টো দিকে দেয়ালের সঙ্গে রাখা সোফায় বসলেন। ওসব আজ খাইনি।
কেন?
ওই যে নতুন ছেলেটিকে এপয়েনম্যান্ট দিয়েছি ওকে নিয়ে ভাত খেলাম।
কবে এপয়েন্টম্যান্ট দিয়েছ?
আজই। এক্সিকিউটিভ হিসেবে রাখলাম। বেশ হ্যান্ডসাম, স্মার্ট ছেলে। এডফার্মের জন্য এই ধরনের ছেলে খুব দরকার।
এই যে এক এডভার্টাইজিংয়ের ব্যবসা ধরেছ, এই করে তো জীবনে কোন উন্নতি হতে দেখলাম না।

উন্নতি খুব একটা দেখনি ঠিকই কিন্তু খেয়ে পড়ে ভালই আছ। গাড়ি বাড়ি আছে, স্টান্ডারড জীবন যাপন।
বাড়ি তো আর এই ব্যবসা থেকে করনি। বাবার সম্পত্তি পেয়েছিলে বলে বেঁচে গেছ। গাড়ি করেছি।
ইস যে গাড়ি! রিকশার চেয়েও খারাপ!
আরজু আবার বিছানায় বসলেন। তোমাকে চা দিতে বলব?
হায়াত সাহেব একটু চমকালেন। আমাকে পরে দিলেও অসুবিধা নেই, ড্রয়িংরুমে চা পাঠাও। যাহ ভুলেই গিয়েছিলাম! ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখেছি।
আরজু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কোন ছেলেটিকে?
যাকে আজ এপয়েন্টম্যান্ট দিলাম। নাম মনে করতে পারছি না।
এ আর নতুন কি কথা! কখনও কি কারও নাম মনে রাখতে পেরেছ তুমি? তোমার নিজের নামটা আজ মনে আছে?
হায়াত সাহেব হাসলেন। নিজের নাম তোমার নাম মেয়েটির নাম এই তিনটি আমার ঝাড়া মুখস্ত। আর কিছু জোকও মুখস্ত আছে। বলব একটা?
না। কিন্তু ওই ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে এসেছ কেন?
তোমাকে দেখাবার জন্য।
আমাকে দেখাবার জন্য! আমার পছন্দ হলে মেয়ে বিয়ে দেবে নাকি?
আরে ধুৎ! ছেলেটির কোথাও থাকার জায়গা নেই। চাকরিটা আজ মাত্র হল। ক'দিন আমাদের এখানে থাকবে তারপর মেস টেস দেখে উঠে যাবে।
আরজু খরচোখে হায়াত সাহেবের দিকে তাকালেন। তুমি কি ছেলেটিকে বলেই নিয়ে এসেছ যে আমাদের এখানে সে থাকবে?
আরে না! সে সাহস কি আমার আছে? ব্যাপারটা আমি এই ভাবে ভেবেছি যে আমাদের দোতলায় একটি রুম একদমই খালি পড়ে আছে। ড্রয়িং ডাইনিং আর কিচেন ছাড়া দোতলার আর কিছু আমরা ব্যবহার করি না। খালি রুমটা হচ্ছে গেস্টরুম। তুমি যদি থাকতে দাও তাহলে সে ওখানে থাকবে।
আর যদি না দিই?
তাহলে যেখানে ছিল ওখানেই থাকবে। যদি ওখানেও না হয় তাহলে অফিসেই কোন একটা ব্যবস্থা করে থাকবে।
আরজু হাসলেন। আমি বুঝেছি।
হায়াত সাহেব খুবই সিরিয়াস মুখ করে বললেন, কি বুঝেছ?
ছেলেটি যে এখানেই থাকবে সে আমি বুঝে গেছি। কিন্তু একটা কথা তোমার ভাবা উচিত ছিল, তোমার মেয়েটি বেশ বড় হয়েছে, বি এ পরীক্ষা দেবে। এই বয়সী মেয়ে যে বাড়িতে আছে সেই বাড়িতে হঠাৎ করে ওই বয়সী অচেনা কোন ছেলেকে আশ্রয় দেয়া ঠিক নয়। কত কি ঘটে যেতে পারে।

brommochari@yahoo.com

ওসব কিছু ঘটবে না।

কি করে বলছ?

এই যে তুমি আছ। আমার ভরসা। তুমি থাকতে আমার কোন চিন্তা নেই। যাও, ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। ওকে চা দাও, কথা টথা বল। আমার ধারণা ছেলেটিকে দেখলে তোমার খুব মায়া হবে। খুবই মায়াবী ধরনের ছেলে।

আরজু উঠলেন। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি এভাবে বসে রইল কেন?

হায়াত সাহেব অবাক হলেন। কি করব?

মেয়ের আসার সময় হলে গেল।

তাতে আমার কি!

তোমার কি! এসে যদি দেখে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে আছ, টের পাবে। তোমার মেয়ে যে লুঙ্গি পছন্দ করে না, খালি গায়ে থাকা পছন্দ করে না ভুলে গেছ?

না না ভুলিনি। এখুনি পাজামা পাঞ্জাবি পরে ফেলছি। তুমি যাও।

আরজু দরজার দিকে পা বাড়ালেন। হায়াত সাহেব বললেন, শোন, একটা জিনিশ কিন্তু ভুলে গেছি।

কি?

আমাদের মেয়েটার নাম যেন কি? ওই যে বিএ পড়ে? কি যেন নাম ওর?

মেয়ে আসুক তাকেই জিজ্ঞেস কর।

তুমি মনে করিয়ে দিতে পারলে ভাল হত।

কেন?

নাম মেয়েটির মনে নেই কিন্তু স্বভাবটি জানি। যদি জানে আমি তার নাম ভুলে গেছি সামান্য সমস্যা হতে পারে।

আমি চাই আজ তা হোক।

আরজু বেরিয়ে গেলেন।

হায়াত সাহেব ঠা ঠা করে হাসতে লাগলেন।

তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব ....

❒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার নাম কি ?

ওমর মাথা নিচু করে বসেছিল। আরজুর কথা শুনে চোখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, ওমর ফারুখ।

চা খাও?

আমি চা খাই না।

আরজু অবাক হলেন। চা খাও না! কখনই খাও না নাকি এখন খাবে না?

লাজুক মুখ করে হাসল ওমর। কখনই খাই না। অভ্যেস নেই।

তাহলে বিসকিট খাও, কেক খাও। কোক বা স্প্রাইট দিতে বলি।

না কিছুই খাব না। খিদে নাই। দুপুরের খাবার খেতে দেরি হয়ে গেছে। এখনও পেট ভরা।

ড্রয়িংরুমের জানালায় হালকা সবুজ রঙের ভারি পর্দা টাঙান। ফলে বিকেলের মুখে মুখে ঘরের ভেতরটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন। এই পরিবেশে ছোটখাট ফুটফুটে চেহারার ওমরকে ভাল লাগছে দেখতে। কেমন আদুরে আদুরে মুখ, মায়াবী চোখ। কথা বলে নরম রাজুক গলায়, মাথা নিচু করে। সহজে মুখের দিকে তাকায় না। এই ধরনের ছেলের জন্য যে কোন মায়ের বুকে তৈরি হবে গভীর মমতা।

আরজুরও হল। অপত্যস্নেহের চোখে ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। এক দু'পলক আরজুর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ জড়সড় ভঙ্গিতে লম্বা সোফাটির এক কোণে বসে রইল ওমর।

আরজু বললেন, বাড়ি কোথায় তোমাদের?

ওমর মুখ তুলল না। মাথা নিচু করেই বলল, ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ শহরেই নাকি গ্রামের দিকে?

শহরেই।

ক'ভাই বোন তোমরা?

আমার কোনভাই বোন নেই। আমি একা।

তাই নাকি! তোমার বাবা মা আছেন?

জ্বী আছেন।

বাবা কি করেন?

মুহূর্তের জন্যে আরজুর দিকে তাকাল ওমর। তারপর মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিজনেস।

তাই নাকি! কিসের বিজনেস?

কন্ট্রাকটরি করেন। ট্রান্সপোর্টের বিজনেসও আছে।

বল কি! তাহলে অবস্থা বেশ ভাল তোমাদের!

মোটামুটি ভালই। চারটে বাড়ি আছে, কয়েকটি দোকান আছে। ভাড়াও পাওয়া যায় বেশ অনেক টাকা।

ওমরের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে অবাক হওয়ার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আরজুর। শুনে

বোঝা গেল ওমরদের অবস্থা তাঁদেরচে দশগুণ ভাল। এই ধরনের ফ্যামিলির একমাত্র ছেলে এসেছে তাঁদের ফার্মে চাকরি করতে! ব্যাপার কি? বাড়ি থেকে রাগ করে চলে আসেনি তো! কোন কারণে অভিমান করে পালিয়ে আসেনি তো বাড়ি থেকে! সরাসরি জিজ্ঞেস করলে এই বিষয়ে হয়ত কথাই বলবে না ওমর। কিছু যদি জানতে হয় জানতে হবে কায়দা করে।

কিন্তু ওমরের চেহারায় আশ্চর্য এক সারল্য আছে। মুখ দেখে মনে হয় এই ছেলে জীবনে কখনও কোন চালাকি করেনি, কখনও বলেনি একটিও মিথ্যে কথা। আরজুর সঙ্গে কি বলবে! তবুও মুখে আসা কথা আটকে রাখলেন আরজু। থাক, আস্তে ধীরে জেনে নেয়া যাবে সব কথা। আরজু বললেন, একটা কিছু অন্তত মুখে দাও ওমর। কিছু যদি না খাও আমার ভাল লাগবে না।

ওমর আবার আরজুর দিকে তাকাল। মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটল তার ঠোঁটে। আগের চেয়েও নরম গলায় বলল, আচ্ছা। একটুখানি নিচ্ছি।

একটি কেকের সামান্য অংশ ভেঙ্গে নিল ওমর। মুখে দিল। ভঙ্গিটি এত সুন্দর, আরজু মুগ্ধ হয়ে ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কেক খেয়ে আধ গ্লাস মতো পানি খেল ওমর। আরজু হঠাৎ করে বললেন, তোমাদের পদবি কী?

চৌধুরী। আমার পুরো নাম ওমর ফারুখ চৌধুরী।

নাম বলার সময় চৌধুরীটা কিন্তু বলনি।

জ্বী না বলিনি। কখনই বলি না।

কেন?

নামটা বেশ লম্বা হয়ে যায়। লম্বা নাম আমার ভাল লাগে না।

ওমরের কথায় হাসলেন আরজু। চোখের সুন্দর ফ্রেমের চশমা কোন ফাঁকে সামান্য নেমে এসেছে। আনমনা ভঙ্গিতে চশমাটা একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, তোমার কি কোন ডাক নাম আছে?

জ্বী না। আমাকে সবাই ফারুখ বলে ডাকে।

কিন্তু আমার কাছে ওমর নামটা বেশি ভাল লাগছে।

আপনি তাহলে ওমর বলেই ডাকবেন।

আরজু খুশি হলেন। তাই ডাকব।

তারপর একটু থেমে বললেন, তোমার বাবার নাম কি?

মোজাফফর হোসেন চৌধুরী। ময়মনসিংহে আমার বাবা খুব নাম করা। একবার এমপি ইলেকশানও করেছিলেন। পাশ করতে পারেননি।

কথাগুলো এত সরল ভঙ্গিতে বলল ওমর শুনে আরজুর আবার ইচ্ছে করল ওমরকে নিয়ে মনের ভেতর তৈরি হওয়া প্রশ্নগুলো করেন। কিন্তু এবারও তা করলেন না তিনি। করলেন অন্য ধরনের প্রশ্ন। তুমি পড়াশুনা শেষ করেছ?

মাষ্টার্স করিনি। গত বছর অনার্স করেছি।

কোন সাবজেক্টে?

পলেটিক্যাল সায়েন্স।

তুমি রাজনীতি কর?

জ্বী না।

কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে শুনলেই মনে হয় সে রাজনীতি করে। কিন্তু মাষ্টার্স করলে না কেন?

ওমর মাথা নিচু করল। এমনি।

আরজু বুঝলেন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে ওমর। তিনি আর ওই নিয়ে কথা বললেন না। বললেন অন্য কথা। তুমি যে ময়মনসিংহের ছেলে এটা একদম বোঝা যায় না। তুমি বেশ সুন্দর ভাষায় কথা বল। তুমি কি ঢাকায় থেকে পড়াশুনো করেছ?

জ্বী না, ময়মনসিংহেই।

তাহলে?

ওমর সুন্দর করে হাসল। আমাদের ফ্যামিলিটা একটু সাংস্কৃতিক মনা। আমার মা এক সময় চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন। আমাকে গান শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, হয়নি। তবে খানিকটা কবিতা আবৃত্তি করতে শিখেছিলাম। আমার মা খুব সুন্দর উচ্চারণে কথা বলেন।

তুমি তোমার মায়ের দিকটা পেয়েছ।

ওমর আবার মৃদু হাসল। মনে হয়।

তার মানে মা তোমাকে খুব ভালবাসেন?

ওমর একটু উদাস হল, আনমনা হল। দুঃখী গলায় বলল, খুব ভালবাসেন। আমি আমার মায়ের জান। মার কথা ভেবেই বাড়ি ছেড়েছি আমি।

তারপর গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এসে লাগল আরজুর বুকে। তিনি যে ব্যাপারটা জানতে চাইছেন ওমর নিজ থেকেই যেন তার খানিকটা বলে দিল। নিশ্চয় মাকে নিয়ে কোন সমস্যা হয়েছে সংসারে, হয়ত সমস্যাটি বেশ বড় রকমের, সেই সমস্যার সমাধান করতেই বাড়ি ছেড়েছে ওমর। কিন্তু এভাবে একটি এডফার্মে চাকরি নিয়ে, একটি বাসায় আশ্রিত থেকে কিভাবে হবে সেই সমস্যার সমাধান! নাকি ব্যাপারটি অন্যরকম।

আরজুর ইচ্ছে হল অনেক প্রশ্ন করেন ওমরকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন ওমরের বাড়ি ছাড়ার মূল কারণ। মার কথা ভেবে কেন বাড়ি ছাড়তে হয়েছে তাকে! কি হয়েছে সংসারে!

কিন্তু এই মুহূর্তেই কি এত কিছু জানতে চাওয়া ঠিক হবে! মাত্র পরিচয় হল ছেলেটির সঙ্গে। তাঁদের ফার্মেই যখন কাজ করবে, তাঁদের বাড়িতেই যখন থাকবে আস্তে ধীরে সব কিছু জানা যাবে। তাড়াহুড়ো করে ছেলেটির মন খারাপ করে দেবার দরকার কি?

যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেল তাতে বোঝা যায় মাকে নিয়ে গভীর কোন কষ্ট তৈরি হয়েছে তার মনে। এখুনি সেই কষ্টের কথা জানতে চাওয়া ঠিক হবে না।

পরিবেশটা বদলাবার জন্য বুয়াকে ডাকলেন আরজু, বুয়া, এগুলো নিয়ে যাও।

brommochari@yahoo.com

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল বুয়া। ওমরের সামনে, সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা কাপ প্লেট তুলে নিয়ে চলে গেল।
বুয়া চলে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই যেন ওমরের অন্য একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলেন আরজু। ওমর পরে আছে আকাশি রঙের স্কিন টাইট জিন্সের প্যান্ট আর একটু মোটা কাপড়ের শাদা ফুলস্লিভ শার্ট। শার্টের বোতামগুলো একটু বড় বড় এবং ধূসর রঙের। ঢোলা হাতে সুন্দর করে গোটান। পায়ে কেডস আছে। সাদা কেডস। তবে বেশ পুরনো, ধুলোয় ধূসর। বোধহয় একই শার্ট প্যান্ট বেশ কয়েকদিন ধরে পরে আছে সে। এসবের পরও ময়লা কিংবা নোংরা মনে হচ্ছে না ওমরকে। জামা কাপড় এবং জুতোয় আশ্চর্য এক বিষণ্ণতা ফুটে আছে তার, আশ্চর্য এক উদাসীনতা ফুটে আছে। মা প্রসঙ্গে কথা বলবার সময় গলায় যে বিষণ্ণতা ফুটেছিল, যে উদাসীনতা খেলা করেছিল এই প্রথম আরজু লক্ষ্য করলেন তার পোশাকেও আছে সেই ভাব। দেখে মনটা আরও কোমল হয়ে গেল তাঁর। তিনি বললেন, তুমি ঢাকায় এসেছ কবে ?
ওমর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, চারদিন হল।
ছিলে কোথায়?
হলে আমার এক বন্ধুর সিটে ডাবলিং করছি।
ঢাকায় তোমাদের কোন আত্মীয়স্বজন নেই?
ওমর বিষণ্ণ মুখে হাসল। আছে, বেশ অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। আমার একমাত্র চাচা, বাবার ছোট ভাই, তাঁর নিজের বাড়ি আছে গুলশানে, শিপিং বিজনেস করেন। এবং আমাদের একটি বাড়ি আছে উত্তরায়। আমাদের মানে আমার বাবার টাকায় তৈরি হওয়া বাড়ি। তবে সেই বাড়ির মালিক আমার বাবা নন অন্য একজন মানুষ। তার কাছে গেলে সেই মানুষ আমাকে সোনায় মুড়িয়ে রাখবেন। কিন্তু আমি তাঁদের কারও কাছে যাইনি। তাঁদের কারও কাছে আমি যেতে চাই না।
কেন? সমস্যা হলে মানুষ আত্মীয়স্বজনের কাছে যায় না?
ওমর কথা বলল না। মাথা নিচু করে রইল।
আরজু বুঝলেন এই নিয়ে কিছু বলতে চাইছে না ওমর। সঙ্গে সঙ্গে কথা অন্যদিকে ঘোরালেন তিনি। আমি বুঝেছি। মানুষের অনেক রকম সমস্যা থাকে। ওসব ব্যাপারে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কি ব্যাগট্যাগ কিছু নেই নাকি এক কাপড়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছ?
জ্বী না, ব্যাগ একটা আছে। এই তো!
ওমরের পায়ের কাছে একপাশে রাখা আছে ছোট্ট কালো রঙের একটা ব্যাগ। বেশ সস্তা ধরনের। ব্যাগটা দেখে ভেতরে ভেতরে বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলেন আরজু। যে পরিবারের ছেলে ওমর তার এত সস্তা ব্যাগ ব্যবহার করবার কথা নয়। ব্যাপারটা কি! সবকিছু কি রকম রহস্যময় মনে হচ্ছে! নাকি ওমর যা বলছে ওসবের কোনটাই ঠিক নয়। বলছে এক আসলে সে আর এক। কিন্তু যে রকম সারল্য মাখা মুখ ওমরের যে সরল ভাষায় সে কথা বলে এরকম মানুষের ভেতরে কি কোন চালাকি থাকতে পারে! হয়ত সব কিছুর আড়ালে লুকিয়ে আছে আরজু কল্পনাও করতে পারবেন না এমন গভীর

বেদনা বোধের এক গল্প। হয়ত সেই গল্প ওমরের মাকে নিয়ে। এসব ভেবে ওমরের জন্য অদ্ভুত এক মমতায় মন ভরে গেল আরজুর। যে মায়ের জন্যে ঘর ছেড়ে এসেছে এরকম এক ছেলে সেই মায়ের যে কি কষ্ট! সেই ছেলের যে কি কষ্ট! দু'জন মানুষের কষ্টের কথা ভেবে বুকটা ভার হয়ে গেল আরজুর। নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর মায়াবী গলায় বললেন, তুমি আজ থেকে এই বাড়িতেই থাকবে। চল তোমার রুম দেখিয়ে দিচ্ছি।
মেয়েকে নিয়ে যা ভেবেছিলেন আরজু সে কথা এখন আর তাঁর মনে নেই।

ভুলে যাই ওর কথা- আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
বলে এসে, 'বাবা, তুমি ভালো আছো, ভালবাসো?'
হাতখানি ধরি তার .....

❒ জীবনানন্দ দাশ

হায়াত সাহেবকে দেখে শিশুর মতো একটা লাফ দিল তুলি। কলেজ থেকে ফিরেছে বলে ঘামে ক্লান্তিতে কালো মিষ্টি মুখখানি ম্লান হয়ে আছে। সেই মুখ উজ্জ্বল আনন্দে ফেটে পড়ল। বাবা তুমি এ সময় বাড়ি!
ঘরে পরার পাজামা পাঞ্জাবি পরে সোফায় বসে আছেন হায়াত সাহেব। তুলিকে দেখে গম্ভীর মুখ করে তাকালেন। কথা শুনে গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার নামটা যেন কি? আচমকা এই ধরনের কথায় যে কারও ভড়কে যাওয়ার কথা। তুলি ভড়কাল না, হায়াত সাহেবের কথা বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না। কাঁধের ব্যাগ বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে হায়াত সাহেবের সোফার হাতলে গিয়ে বসল। দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। কতদিন পর বিকেল বেলা তোমাকে বাড়ি দেখলাম! আমার যে কি ভাল লাগছে! শোন, আমরা এখন ছাদে বসে বিকেলের চা নাশতা খাব। তুমি কিন্তু আর কোথাও বেরুতে পারবে না।
হায়াত সাহেব আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, সবই বুঝলাম কিন্তু আপনি কে? নাম কি আপনার? এভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন যে!
এবার হায়াত সাহেবের গলা ছেড়ে দিল তুলি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আঙুল উঁচিয়ে কপট শাসনের গলায় বলল, দেখ বাবা, ভাল হচ্ছে না কিন্তু!
হায়াত সাহেব তবু দমলেন না। মুখভঙ্গি এবং গলার স্বর কোনটাই বদলালেন না। বললেন, ঠিক আছে আপনি যেই হন, আমার বাড়িতে যখন এসেই পড়েছেন কি দিয়ে

আপনাকে আর আপ্যায়ন করি,একখানা জোক শুনুন। নিজের প্রতিভায় বিগলিত হয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, কি খবর বিশ্বাস সাহেব, আপনার হার্ট যে অপারেশান করে দিলাম তারপর থেকে কেমন লাগছে! বিশ্বাস সাহেব মন খারাপ করে বললেন, আমার তো ভালই লাগছে কিন্তু ছেলেমেয়েরা বলছে আমার হার্টবিট ডাবল শোনা যাচ্ছে। ডাক্তার সাহেব বললেন, তাই তো বলি আমার হাতঘড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না কেন? ওটা নিশ্চয় আপনার হার্টের ওখানে রয়ে গেছে।

তুলি ঠোঁট উল্টে বলল, জমেনি। তুমি সব পচা পচা জোক বল। আজকাল কত সুন্দর সুন্দর জোক বেরিয়েছে। তোমারগুলো শুনলে হাসি পাওয়া তো দূরের কথা, একটা লোক এত অখাদ্য জোক বলছে শুনে লজ্জায় কান্না পেয়ে যায়। ছিঃ!

হায়াত সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মা মেয়ে এবং ছোট্ট ছেলে ট্রেনে করে যাচ্ছে। মেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আর মা বই পড়ছেন। মেয়ে এক সময় বলল, আগের স্টেশনটার নাম কি মা, ওই যে গাড়িটা যেখানে শেষে থেমেছিল! মা বললেন, কি জানি! দেখছ না আমি বই পড়ছি। তাছাড়া তোমার তাতে দরকারই বা কি! মেয়ে বলল, না আমার দরকার নেই তবে তোমার দরকার থাকতে পারে। মা বললেন, কেন? মেয়ে বলল, ছোট ভাই ওখানে নেমেছিল, আর ওঠেনি।

তুলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, এটাও তেমন সুবিধের হয়নি। ওই একই রকম।

হায়াত সাহেব তবু দমলেন না। বললেন, এটা লাস্ট। যদি এটাও না জমে তাহলে আজ আর জমবেই না। আজ আর বলবই না। পায়ে ধরলেও বলব না।

সোফার হাতলে আবার বসল তুলি। আবার জড়িয়ে ধরল হায়াত সাহেবের গলা। হায়াত সাহেব বললেন, ভদ্রলোক বলছেন, জানেন আমার কুকুরের না কোন লেজ নেই। শুনে অন্য ভদ্রলোক খুবই অবাক হলেন। তাহলে কি করে বোঝেন যে ওর আনন্দ হচ্ছে। কুকুর তো আনন্দে লেজ নাড়ে। কুকুরওয়ালা ভদ্রলোক হেসে বললেন, ও আমি বুঝতে পারি। আমার কুকুরটির যখন খুব আনন্দ হয় তখন সে আর আমাকে কামড়ায় না।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল তুলি। হায়াত সাহেবের মাথার কাছে মুখ নামিয়ে বলল, এটা খুব ভাল হয়েছে। খুব সুন্দর।

মেয়েকে হাসতে দেখে হায়াত সাহেবও হাসলেন। তুই যে আমার মেয়ে, তোর নাম যে তুমি এটা আমি তোর হাসি শুনে বুঝতে পারলাম।

তুকি কি ডেনটিস্ট?

হায়াত সাহেব অবাক হলেন। আমি ডেনটিস্ট হতে যাব কেন?

ওই যে এক ডেনটিস্টের গল্প আছে না—পরিচিত যে কোন লোককে দেখলে বলে আপনাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে। হা করুন তো। লোকটি হা করলে তার দাঁত দেখে বলে ও আপনি হায়াত সাহেব, না? ভাল আছেন।

হায়াত সাহেব বললেন, আমার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছিস, না!

তুলি আবার হেসে উঠল। তারপর অবাক হল। তুমি এখানে একা বসে আছ যে, মা কোথায়!

বাড়িতেই আছে।

কোথায়?

ড্রয়িংরুমে। গেস্ট আছে।

এ সময় আবার কে এল?

আছে একজন। তুই চিনবি না

আমার চিনবার দরকারও নেই। আমি আমার রুমে যাচ্ছি, মা এলে বলবে আমার খুব খিদে পেয়েছে, প্রচুর নাশতার ব্যবস্থা যেন করে।

তুই যে পরিমাণ মোটকা হয়েছিস, প্রচুর নাশতা খেলে পদে পদে হোচট খাবি। কোন দরজা দিয়েই ঢুকতে পারবি না। তোকে থাকতে হবে বাইরে। প্রথমে ঘরের বাইরে তারপর বাড়ির বাইরে। প্রথমে ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবি না, তারপর বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকতে পারবি না। বাড়ির গেট সব সময়ই ঘরের দরজার চেয়ে বড় হয়।

তাতে আমার কোন অসুবিধা নেই। তুমিও তো আমার সঙ্গেই থাকবে। আমি আমার বাবার সঙ্গে থাকলাম। তবে তোমার সঙ্গে বাইরে থাকতে হলে আমার আরও কয়েকটা দিন সময় লাগবে। মোটা দৌড়ে আমি তোমার সঙ্গে পারছি না।

কথাটা বুঝতে পারলেন না হায়াত সাহেব। বললেন, কেন?

যে পরিমাণ মোটা আজই তোমাকে দেখাচ্ছে, আমার মনে হয় কাল পরশুর মধ্যেই তুমি আর এ বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না। সপ্তাখানেক পর পারবে না বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকতে। তোমার সাইজে যেতে আমার আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

হায়াত সাহেব হাসতে লাগলেন। তুলিও হাসল। হাসতে হাসতে বিছানার ওপর থেকে ব্যাগটা নিল, বাইরে এল।

এই বাড়ির তিনতলার অর্ধেকটা জুড়ে রুম, বাকি অর্ধেকটায় খোলা ছাদ। সেখানে নানা রকমের টবে নানা রকমের গাছ। আজ বিকেলে অপরূপ লাগছে ছাদটা। মা বাবার বেডরুম থেকে বেরিয়ে নিজের রুমের দিকে পা বাড়িয়েছে তুলি, ছাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে অদ্ভুত এক আনন্দে মনটা ভরে গেল তার। নিজের রুমে না গিয়ে ব্যাগ হাতে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। যেন ভুলে গেল খানিক আগে কলেজ থেকে ফিরেছে সে। বাবার সঙ্গে নানা রকম মজা করেছে। এবং তার খুব খিদে পেয়েছে।

কোন কোন সময় এমন হয়, নিজের অজান্তেই নিজের অনেক কিছু ভুলে যায় মানুষ। তুলি বেরিয়ে যাওয়ার পর কি ভেবে হায়াত সাহেবও বেরুলেন ঘর থেকে। বেরিয়েই তুলিকে দেখতে পেলেন নিজের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত এক আনমনা ভঙ্গি তার। দেখে মাথায় একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি এল হায়াত সাহেবের। এখুনি দোতলায় যাবেন তিনি, গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বলবেন, ওমরের ব্যাপারে কিছুই যেন আপাতত তুলিকে না জানান হয়। হায়াত সাহেব চাইছেন হঠাৎ করেই যেন তুলির সঙ্গে ওমরের দেখা হয়। অচেনা একটি ছেলেকে নিজের বাড়িতে জাকিয়ে বসে থাকতে দেখে তুলির রিয়্যাকশানটা কি রকম হয় হায়াত সাহেব একটু দেখতে চান। যে কোন ব্যাপারেই মজা করতে মজা পান তিনি।

মুখে দুষ্টুমির একটা হাসি নিয়ে হায়াত সাহেব তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলেন। তুলি তখনও ছাদের দিকে তাকিয়ে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না তার।

brommochari@yahoo.com

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটিরে?
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি
কুঞ্জ কুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা তীরে।
ও দু'টি নয়নমণি চিনি যে গো আমি চিনি,
কাজল মধুপ ছায়া দেখেছি ফুল শিশিরে।

❒ অতুলপ্রসাদ সেন

ড্রয়িংরুমে ঢুকে তুলি একেবারে থতমত খেয়ে গেল। অচেনা এক যুবক বসে আছে সোফায়। বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পরনে ব্লু জিনস আর হাফ হাতা শাদা গেঞ্জি, পায়ে কেডস। বোধহয় খানিক আগে গোসল করেছে। মাথার চুল কেমন ভেজা ভেজা। মুখখানি অদ্ভুত সুন্দর এবং আশ্চর্য রকমের পবিত্র। তুলির পায়ের শব্দে তুলির দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে যুবক। কয়েক পলক তাকে দেখে তুলি বলল, আপনি যেন কে?

যুবক নরম সুন্দর গলায় বলল, ওমর। আমার নাম ওমর।

কিন্তু আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। তবে মুখটা বেশ চেনা চেনা। মনে হচ্ছে কোথায় যেন আপনাকে আমি দেখেছি। কোথায় দেখেছি বলুন তো?

ওমর হাসল। কোথাও দেখবার কথা নয়। আমি ঢাকায় এসেছি মাত্র পাঁচদিন হল।

আগে কোথায় ছিলেন?

ময়মনসিংহে।

তুলি একটু চিন্তিত হল। ময়মনসিংহে আমাদের কোন আত্মীয় আছে বলে তো জানি না।

আমি আপনাদের আত্মীয় নই।

তাহলে?

ওমর কথা বলবার আগেই তুলি মৃদু হেসে বলল, বুঝেছি। আপনি নিশ্চয় বাবার কাছে এসেছে, মডেলিং করবেন। বাবার কাছে অবশ্য এ রকম অনেকেই আসে।

ওমর আবার হাসল। আমি মডেলিং করার জন্য আসিনি। আমি আপনাদের ফার্মে কাজ করি।

তুলি খুব অবাক হল। তাই নাকি! কবে থেকে?

কালই জয়েন করেছি।

তাই বলুন। আগে থেকে কাজ করলে আপনাকে না চিনবার কথা নয় আমার। আমাদের

ফার্মের প্রত্যেককেই আমি চিনি। নতুন যারা জয়েন করে তাদের সঙ্গেও দু'চার দিনের মধ্যেই পরিচয় হয়ে যায় আমার। আমি প্রায়ই আমাদের অফিসে যাই।

একটু থেমে তুলি বলল, এত সকাল সকাল কোত্থেকে এলেন আপনি? বাবা আসতে বলেছেন? কিন্তু বাবা এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। নটার আগে উঠবেন না। এই বাড়িতে আমি সবার আগে উঠি। সাতটার মধ্যে। আপনাকে নিশ্চয়ই কেউ চাটা দেয়নি! আমি চায়ের কথা বলে আসছি। আপনি বসে চা খান বাবা উঠলে পাঠিয়ে দেব।

ওমর আবার হাসল। খবরের কাগজটা ভাজ করে সোফার এক পাশে রাখল। তারপর নড়েচড়ে বসল। প্রথম কথা হচ্ছে আমি চা খাই না। দ্বিতীয় কথা, আমি সকালবেলা আসিনি, কাল বিকেলে এসেছি। এই বাড়িতেই ছিলাম। কিছুদিন আপনাদের এখানে থাকব। ঢাকায় আমার কোথাও থাকার জায়গা নেই শুনে স্যার আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। আপনার আম্মার সঙ্গেও কাল আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। শুধু আপনার সঙ্গেই দেখা হয়নি। এখানে থেকে আপনাদের ফার্মে কাজ করব আর বাসা কিংবা মেসটেস খুঁজব। পেলে চলে যাব। আপাতত এই হচ্ছে আমার অবস্থা।

এতটা অবাক অনেক কাল হয়নি তুলি। নিজের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে কাল বিকেলে যেমন তন্ময় হয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল ঠিক সেই ভঙ্গিতে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কয়েকপলক ওমরও তাকিয়ে রইল তুলির দিকে তারপর বলল, আপনি খুব অবাক হয়েছেন, না?

তন্ময় ভাবটা ভেঙে গেল তুলির। চিন্তিত ভঙ্গিতে সে বলল, হ্যাঁ বেশ অবাক হয়েছি। কারণ কাল বিকেল থেকে আপনি আমাদের বাসায়, একজন নতুন মানুষ এসে থাকছে আমাদের বাসায় আর আমি তা জানি না! এরকম ঘটনা এই বাড়িতে আগে কখনও ঘটেনি। মা বাবা বোধহয় ইচ্ছে করে ব্যাপারটা আমার কাছে চেপে রেখেছে।

ইচ্ছে করে চেপে রাখবেন কেন? এটা কি চেপে রাখার মতো ব্যাপার!

না তা নয়। হয়ত আমার সঙ্গে মজা করার জন্যই করেছেন।

ওমর খুব সরল গলায় বলল, মজা করবার মতো কি হল? এতে মজার কি আছে?

এই যে হঠাৎ করে আপনাকে দেখে আমি চমকালাম, কেউ পরিচয় টরিচয় করিয়ে দিল না, নিজে নিজেই কথা বলে নিলাম, এটাই তো এক ধরনের মজা। তবে আমি সিওর এটা বাবার আইডিয়া। বাবা দেখতে এত মোটা হলে কি হবে বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, খুব চিকন বুদ্ধির লোক বাবা। মার মাথায় এসব আসত না। তাছাড়া বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অদ্ভুত ধরনের। আপনি তো থাকবেন এখানে আস্তে ধীরে টের পেয়ে যাবেন সব। বাবা এবং আমি কি যে সব কাণ্ড কারখানা করি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় বাবা আমার বাবা নয়, বাবা আমার বন্ধু। বাবা আর আমার যেন একই রকম বয়স। আমি দেখতেও বাবার মতো তো। নিশ্চয়ই আপনি এতক্ষণে তা বুঝে গেছেন।

এবার তুলির পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলাল ওমর। তারপর মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ আপনি দেখতে স্যারের মতো। তবে যে সব মেয়ে দেখতে বাবার মতো হয় তারা খুব ভাগ্যবতী। আপনি কি এটা জানেন? শুনেছেন কখনও?

শুনেছি। একথা সবাই বলে। আর যেসব ছেলে দেখতে মায়ের মতো তারা হয়

ভাগ্যবান। আপনি কি একথা কখনও শুনেছেন?
ওমর হাসল। শুনেছি।
আপনি দেখতে কার মতো? আপনার বাবার মতো নাকি মায়ের মতো?
মায়ের মতো।
তাহলে তো আপনার সঙ্গে আমার খুব মিল। আমি ভাগ্যবতী আর আপনি ভাগ্যবান। আর একটা মিলও আছে। আপনি মা বাবার একমাত্র মেয়ে আর আমি হচ্ছি আমার মা বাবার একমাত্র ছেলে।
তাই নাকি! বেশ মজা তো!
এবার সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি কথা বলল ওমর। আপনি কিন্তু দাঁড়িয়েই কথা বলছেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এই মাত্র পরিচয় হওয়া একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে আর ছেলেটি বসে থাকবে এটা দেখতে ভাল লাগে না। খারাপ লাগে।
তুলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি আসলে এতক্ষণ কথা বলতাম না কিংবা দাঁড়িয়েও থাকতাম না, আপনার ব্যাপারটা জানার পর আপনার সঙ্গে কথা বলছি ঠিকই কিন্তু আমার মাথায় খেলছে অন্য একটা চিন্তা। বাবা আমার সঙ্গে যে চালাকিটা করেছে এর কি ধরনের জবাব দেয়া যায়। জবাবটা আমি এমন দিতে চাই, বাবা যেন খুবই অবাক হয়। যেন দিশেহারা হয়ে যায়। যেন বুঝতেই না পারেন আমি তার কি ধরনের জবাব দিলাম।
দাঁতে ঠোঁট কামড়ে আনমনা হয়ে গেল তুলি।
ওমরও খানিক আনমনা হয়ে রইল তারপর হাসিমুখে বলল, এ ব্যাপারে আমি কি আপনাকে একটু হেলপ করতে পারি?
তুলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, পারেন। নিশ্চয় পারেন।
একটা কাজ করুন, আমি এখনই সরাসরি অফিসে চলে যাই। আপনি স্যারকে বলবেন খুব সকালে একটা ছেলে এসেছিল বাড়িতে, চেনা নেই শোনা নেই দেখি ড্রয়িংরুমে বসে আছে। আমি ভেবেছি বুয়া বসিয়েছে। তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি বলেছি মডেলিংয়ের ব্যাপারে কথাটথা বাসায় কখনও বলেন না বাবা। তাঁর সঙ্গে বাসায় দেখা করাও নিষেধ। আপনি চলে যান, অফিসে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করবেন।
শুনে লাফিয়ে উঠল তুলি। গুড আইডিয়া। আপনি তাহলে চলে যান। দেরি করবেন না।
ওমর হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে কিন্তু টুকটাক আরও অনেক কথা বলতে হবে। নয়ত ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। যেমন, আমাকে কোন কথা বলার সুযোগই দেননি আপনি। আমি নানা রকমভাবে আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি আপনি কিছুই বুঝতে চাননি। আমাকে ধমক দিয়েছেন, ভাবটা এই রকম যেন প্রয়োজন হলে আমাকে আপনি মারবেন কিংবা ঘাড় ধাক্কা দেবেন।
ঠিক আছে ওসব আমি সামলাতে পারব। আপনি ভাববেন না। এসব আমি ভালই বুঝি। কিন্তু অফিসে গিয়ে বাবা যখন আপনার কাছে সব জানতে চাইবেন? আপনি কি বলবেন?

একথাই বলব। আপনি আমাকে বের করে দিয়েছেন, আমার কোন কথা শোনেননি পারলে মারেন, ইত্যাদি।
তুলি খুশি হয়ে গেল। ঠিক আছে। আমি তাহলে ওপরে যাচ্ছি। আপনি চলে যান। দেরি করবেন না। বাবার ওঠার সময় হয়ে গেছে। বোধহয় এতক্ষণে উঠেও গেছে।
তুলি ড্রয়িংরুম থেকে বেরুল। মাত্র দরজার বাইরে পা দিয়েছে, ওমর বলল, শুনুন। আপনার নামটা কিন্তু আমার জানা হয়নি।
তুলি।
শুনে তুলির চোখের দিকে তাকাল ওমর। যথার্থ নাম। তুলিতে একটু রঙ লাগিয়ে দিতে পারলেই হয়, দ্রুত যে কত ছবি আপনি এঁকে ফেলতে পারবেন।
তুলি চোখ সরু করল। কথাটা আমি বুঝতে পারিনি। বেশ কঠিন মনে হচ্ছে।
ওমর হাসল। এই যে আইডিয়া দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ মজার একটা কাজ আপনি করতে যাচ্ছেন এও কিন্তু এক ধরনের ছবি আঁকাই। খানিক পরেই আপনার কথা শুনে অন্য রকমের একটা পরিবেশ তৈরি হবে বাড়িতে। আপনি নিজেকে তুলি ভাবুন আর ওই পরিবেশটিকে ভাবুন আপনার আঁকা ছবি। ব্যস হয়ে গেল।
তুলি চোখ বড় করে বলল, বাব্বা আপনি তো বেশ কঠিন লোক! কি রকম ঘুরিয়ে প্যাচিয়ে কথা বলেন? তবে বলেন খুব সুন্দর করে। শুনতে বেশ লাগে। নাটকে অভিনয় করেন নাকি?
ওমর লাজুক গলায় বলল, এখন আর করি না।
তার মানে আগে করতেন।
করতাম।
কোথায়? স্টেজে না টিভিতে?
স্টেজে করেছি রেডিওতে করেছি টিভিতে করেছি।
তাই তো বলি আপনাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন? টিভি নাটকে আপনাকে আমি দেখেছি। কি কি নাটক করেছেন বলুন তো?
নাম নেই।
তুলি অবাক হল। নাম ছাড়া আবার নাটক হয় নাকি?
হয়। যারা কখনও কোথাও অভিনয় করেনি তাদের প্রতিটি নাটকই নাম ছাড়া। যেমন আমি।
তুলি ফ্যালফ্যাল করে ওমরের দিকে তাকাল। মানে কি কথাটার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।
ওমর হাসল। মানে হল আপনি আমাকে কখনও টিভিতে দেখেননি কারণ আমি টিভি সেন্টারই চিনি না, অভিনয়ের অও জানি না।
তাহলে যে বললেন।
মজা করার জন্য বললাম।
শেষ কথাটা এত সুন্দর করে বলল ওমর তুলি মুগ্ধ হয়ে গেল। তবে আর দাঁড়াল না।

brommochari@yahoo.com

মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর।
একই সে মুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ;
সে মুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর;

❒ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আরজু বললেন, তোমরা তিনজন কি এখন একসঙ্গে বেরুবে?

হায়াত সাহেব জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, তিনজন মানে?

তুমি তুলি আর ওমর।

তাই তো বেরুন উচিত। প্রতিদিন তুলিকে আমি কলেজে নামিয়ে দিয়ে যাই, আজও দিয়ে যাব।

সঙ্গে যে ওমর থাকবে?

জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে হায়াত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন, হাসলেন। থাকবে। কিন্তু তুমি যে একটা রহস্য তৈরি করে রেখেছ মনে আছে?

কি রহস্য যেন?

আরজু বুঝলেন ঠিকই সব কিছু মনে আছে হায়াত সাহেবের তবুও ইচ্ছে করে এমন করছেন। মানুষটির স্বভাবই এমন। সারাক্ষণই মজা করছেন। কি করে যে পারেন! আরজু বললেন, আমি শুনেছি মোটা মানুষরা খুব রসিক হয়। কিন্তু কখনও বিশ্বাস করতাম না। তোমাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে।

কবে থেকে?

যখন থেকে তুমি মোটা হতে শুরু করলে তখন থেকে।

আমি কিন্তু বিয়ের আগ থেকেই মোটা। বলতে পার ছেলেবেলা থেকেই। রসিকও তখন থেকেই।

বাজে কথা বল না। বিয়ের সময় এত মোটা ছিলে না তুমি।

একটু কম ছিলাম, তবে মোটা ছিলাম। শোন, মোটা মানুষেরা শুধু রসিকই হয় না, মানুষ হিসেবেও ভাল হয়। আমাকেও দেখেও কি তুমি তা বোঝনি!

আরজু হাসলেন। কি শুরু করলে সকালবেলা!

হায়াত সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ঠাট্টা নয়, আমি সিরিয়াসলি বলছি। তুমি দেখবে মোটা মানুষরা ক্রাইম খুব কম করে। যারা সত্যিকার ক্রিমিনাল তারা সবগুলো রোগা, পেরেকের মতো দেখতে একেকটা। যেখানে গাঁথে এমন করে গেঁথে যায়, হাজার চেষ্টায়ও তোলা যায় না। খুব কঠিন হয়ে যায় তোলা। মোটারা ক্রিমিনাল হয় না। হবে কি করে! ক্রাইম করতে হলে মাথায় ঘিলু থাকতে হয়। মোটাদের মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই। যেমন তুমি।

এটা ঠিক নয়। ঘিলু না থাকলে তোমার মতো মহিলাকে হ্যান্ডেল করতে পারতাম! কত খেলা তুমি আমাকে দেখাতে!

বাজে কথা বল না। চল নিচে চল। নাশতা রেডি।

মেয়েটি আসুক।

মেয়ের কথায় আবার ওমরের কথা মনে পড়ল আরজুর। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওমরকে নিয়ে যে রহস্যটা পাকিয়ে রাখলে সেটার এখন কি হবে! নাশতার টেবিলে এখুনিই তো ওমরের সঙ্গে তুলির দেখা হয়ে যাবে!

হায়াত সাহেব নির্বিকার গলায় বললেন, হোক, অসুবিধা কি?

তাহলে কাল রাতে এই নাটকটা কেন করলে? ছেলেটিকে একা একা খাইয়ে তার রুমে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম আমি। তুমি আর তোমার মেয়ে নিচেই নামলে না। এই রুমে বসে ভাত খেলে! কোন মানে আছে এসবের?

হায়াত সাহেব আবার হাসলেন। কাল ওরকম মনে হয়েছিল করেছি। আজ কিছুই মনে হচ্ছে না, আজ কিছুই করব না। সবকিছুর অত মানে খোঁজা কেন। অর্থহীন কোন কোন কাজের মধ্যেও মজা আছে।

কলেজের ব্যাগ কাঁধে তুলি এসে ঢুকল এই রুমে। চল বাবা।

হায়াত সাহেব চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন। আকাশি রঙের কামিজ আর সাদা সালোয়ার পরা তুলিকে এখন বেশ অন্যরকম দেখাচ্ছে। কলেজ ড্রেস পরার ফলে কেমন ছোট হয়ে গেছে মেয়েটি। মোটাও একটু কম লাগছে। রাতে ফ্রেস ঘুম হলে সকালবেলা এমনিতেই চেহারা সুন্দর হয়ে যায় মানুষের। তুলিও হয়েছে। দেখতে বেশ ভাল লাগছে তুলিকে। হায়াত সাহেব মুগ্ধ গলায় বললেন, বাহ মেয়েটিকে তো আমার খুব সুন্দর লাগছে। তুই এত সুন্দর হলি কি করে?

তুলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি সব সময়ই সুন্দর।

একথায় হায়াত সাহেব অন্য লাইন ধরলেন। তাই নাকি! কখনও দেখিনি তো! আমার বোধহয় চোখটা খুব খারাপ ছিল। আজ হঠাৎ করে ভাল হয়ে গেছে।

না তা নয়, তুমি আমার দিকে কখনও ভাল করে তাকাওনি!

না না তাকিয়েছি, তাকিয়েছি। তবে সব সময়ই তোকে আমি খুব মোটা দেখি। প্রায় আমার মতো। আজ একটু স্লিম সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি লাগছে।

তুলি চোখ পাকিয়ে বলল, দেখ বাবা, সকালবেলা আমার মেজাজ খারাপ করবে না।

এতে মেজাজ খারাপ করা ঠিক হবে না। তোকে মোটা দেখতেও আমার খুব ভাল

লাগে। গর্বে বুক ভরে যায়। মনে হয় মোটা না হলে সে আমার মেয়ে হবে কি করে! মেয়ে যদি বাপের মতোই না হল তো কার মতো হবে! মেয়ে কি তার মায়ের মতো হবে? মোটেই না। মেয়ে হবে অবিকল তার বাপের মতো। দরকার হলে দাড়ি গোঁফও থাকবে তার মুখে।

আরজু হেসে বললেন, কি শুরু করলে তোমরা! নাশতা ঠাণ্ডা হচ্ছে!

তুলি বলল, আমারও প্রথম ক্লাসটা কিন্তু মিস হবে। বাবা যা শুরু করেছে।

এবার উঠলেন হায়াত সাহেব। না মিস হবে না। চল।

আগে পরে হেঁটে দোতলায় নেমে এল তিনজন মানুষ। হায়াত সাহেব কিংবা আরজু কেউ খেয়াল করলেন না তুলির ঠোঁটে তখন মিটমিটে একখানা হাসি।

ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে আরজুর দিকে তাকালেন হায়াত সাহেব। বললেন ওমরকে ডাক।

নিজের চেয়ারে মাত্র বসেছে তুলি। হায়াত সাহেবের কথা শুনে তাঁর দিকে তাকাল—ওমর কে?

তুই চিনবি না।

আমি চিনব না অথচ তাকে তুমি ডাইনিং টেবিলে ডাকছ!

হায়াত সাহেব আরজুর দিকে তাকালেন। হাসতে হাসতে বললেন, রহস্য...

আরজু।

না? বেশ ফর্সা, খাড়া নাক, ক্লিন সেভড। মাথার চুল খুব ঘন। জিনস পরে। পায়ে শাদা কেডস।

আরজু ও হায়াত সাহেব মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। আরজু বললেন, হ্যাঁ ওরকমই কিন্তু তুই দেখলি কোথায়? তুই তো কাল আর নিচে নামিসনি।

আজ সকালে দেখেছি। ড্রয়িংরুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। দেখে আমি তো ভেবেছি, না না ভাবিনি, প্রথমে কিছুই ভাবিনি। চেহারাটা খুবই চেনা চেনা লাগল, বুঝলে। মনে হল টিভিতে বোধহয় দেখেছি। মডেলিং করে। তারপর ভাবলাম সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিশ্চয় বাবার সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছে। বোধহয় শুনেছে বাবার এডফার্ম আছে। কিছু না বুঝে বুয়া তাকে ড্রয়িংরুমে এনে বসিয়েছে। কিন্তু আমি তো জানি অফিসের কোন কাজ বাড়িতে বসে করে না বাবা। এমন কি ওসব কাজে কেউ দেখা করতে এলেও বিরক্ত হয়। তাছাড়া তখন সাড়ে সাতটার মতো বাজে, বাবা তো উঠবে নটায়।

কথা কিছু রেখেই বাবা এবং মায়ের দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকাল তুলি।

হায়াত সাহেব ধপ করে নিজের চেয়ারে বসলেন। স্বভাব সুলভ গলায় বললেন, কাহিনী

তো বেশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ছোট কর মা জননী। ছোট হলে শুনতে ভাল লাগবে।

তুলি সরল মুখ করে হাসল। ডিটেল না বললে ঘটনাটা তো তোমার বুঝবেনা।

আরজু বললেন, আচ্ছা বল।

আমি সরাসরি বললাম, দেখুন আমাদের বাড়িতে এত সকালবেলা এভাবে এসে আপনি মোটেই ভাল করেননি। মডেলিং করবেন ভাল কথা, অফিসে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করবেন, এখানে নয়। আপনি দেখতে শুনতে ভাল, বাবা হয়ত আপনাকে পছন্দও করবেন। কিন্তু আমার বাবা যেমন ভাল তেমন খারাপ, বাড়িতে এসেছেন এই অপরাধে উনি হয়ত আপনাকে মডেলই করবেন না। যান বাবা ঘুম থেকে ওঠার আগে চলে যান। ছেলেটি কি কি বলার চেষ্টা করল আমি তাকে কোন কথা বলার সুযোগই দিলাম না। ধমকে বের করে দিয়েছি। ভাল করেছি না বাবা?

হায়াত সাহেব একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু স্বামীর দিকে তাকিয়ে রাগে ফেটে পড়লেন আরজু। হল এখন? রহস্যের মজা হল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ছেলেটি কি ভাববে?

তুলি অবাক গলায় বলল, কোন ছেলেটি মা?

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন আরজু। তুমি চুপ কর। তুমি আর কথা বল না। যেমন বাপ তেমন মেয়ে। দুটো উন্মাদ নিয়ে পড়েছি আমি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

[illegible]

কাল সন্ধ্যে থেকে এই বাড়িতেই আছে সে।

তুমি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বল কি! ছি ছি ছি তাহলে তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে। এভাবে একটি লোককে বাড়ি থেকে বের করে দিলাম!

এবার কথা বললেন আরজু। তুমিই বা কেমন মেয়ে! এত বড় হয়েছ বুঝতে শেখনি কিছু। একটি ছেলেকে বাড়িতে দেখলে আর অমনি তার ওপর হম্বিতম্বি শুরু করলে! তাকে কোন কথা বলার সুযোগ দিলে না! ছেলেটি কি বলছে তুমি শুনবে তো! নিশ্চয় সে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে সে মডেলিং করতে আসেনি, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, সে এই বাড়িতেই থাকে।

তুলি কথা বলল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। তবে তার তখন খুব হাসি পাচ্ছে। হাসির তোড়ে বুক ফেটে যাচ্ছে। বাবাকে বেশ একটা বিপাকের মধ্যে ফেলা গেছে। শুধু বাবাকে কেন, মাকেও। দু'জনেই এখন ওমর ওমর করে বিব্রত। তুলি যা চেয়েছে তাই হয়েছে।

তুলি মনে মনে বলল, আমার সঙ্গে রহস্যের মজা এখন বোঝ!

আরজু বলল, নাশতা না করে এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটি, আমার তো

brommochari@yahoo.com

এখন নাশতাই খেতে ইচ্ছে করবে না। শুধু ওর কথা মনে হবে।
হায়াত সাহেব বললেন, তোমার আবার মায়াটা বেশি।
বেশি হবে না! তোমাদের মতো নির্মম হব নাকি, পাষাণ হব নাকি!
আমাকে তুমি পাষাণ হতে দেখলে কোথায়? পাষাণ হলে ওমরকে আমি চাকরি দিতাম! অভিজ্ঞতা নেই, কিছু জানে না, জীবনে কোথাও কখনও চাকরি করেনি শুধুমাত্র মুখ দেখা মায়া লেগেছে বলে এমন একটি ছেলেকে আমি চাকরি দিয়েছি, থাকার জায়গা নেই শুনে বাড়ি নিয়ে এসেছি তারপরও আমাকে তুমি পাষাণ বলছ! বুঝলাম মানুষের জন্য তোমার মমতা একটু বেশি কিন্তু আমারও কম নয়। তুমি ভেবে দেখ মোটা মানুষেরা খুব দয়ালু হয়। আমি বুঝেছিলাম আমি যতটুকু আগ্রহ করে ছেলেটিকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি, ওর মুখ দেখে, ওর সঙ্গে কথা বলে তারচে অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে তুমি ওকে এই বাড়িতে থাকতে দেবে। ব্যবসায়ী হয়েও ব্যবসা বাণিজ্য আমরা দু'জনের একজনও বুঝি না। ওমরকে আড়াই হাজার টাকা মাইনে দেব আমি। তারপর ওপর ব্যবস্থা যা হয়েছে তাতে ওর দু'বেলার খাবার ফ্রি। সকালবেলা আর রাত। দুপুরে হয়ত সে নিজের পয়সার খাবে। থাকা তো ফ্রিই। পাষাণ হলে কেউ এতটা করে!
আরজু এত কথা বুঝতে চাইলেন না। বললেন, দুপুরের খাওয়াও ওকে আমি বাইরে খেতে দেব না। তোমার আর একটা লাঞ্চ বক্স আছে ওতে করে খাবার দিয়ে দেবো। তাহলে তো সোনায় সোহাগা। বোঝ এবার।
মা বাবার কথার ফাঁকে দুতিনবার আড়চোখে তাদের মুখের দিকে তাকিয়েছে তুলি। শেষবার তাকাতে গিয়ে হায়াত সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাবার জন্য বলল, আমার কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা। তাড়াতাড়ি কর।
হায়াত সাহেব বললেন, ঠিক আছে খেতে শুরু কর।
তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ! খেতে বস।
আরজু গম্ভীর গলায় বললেন, না আমি খাব না। আমার খেতে ভাল্লাগবে না।
খাও, খাও। আমি অফিসে গিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করছি। ওমরকে সব বুঝিয়ে বলব। বলব ভুলটা তুলির নয়, ভুলটা আসলে হয়েছে আমার। মেয়ের সঙ্গে রহস্য করতে গিয়ে ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছি আমি। এই নিয়ে আর ভেব না। বস।
আরজু বসলেন। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে খেতে শুরু করল তুলি। তার ঠোঁটে তখনও রহস্যময় সূক্ষ্ম হাসি। মা বাবা কেউ তা খেয়াল করল না।

সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুক ভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়ে বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

❐ জসীম উদ্দীন

এই ফার্মের পুরনো কর্মচারী রায় বাবু। পুরো নাম সুধীরচন্দ্র রায়। কিন্তু সবাই রায় বাবু বলে ডাকে। ফার্মের শুরু থেকেই হায়াত সাহেবের সঙ্গে আছে। এই ফার্মের এমন কোন কাজ নেই যা তিনি না জানেন। তবে তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে ক্যাশ দেখাশোনা। টাকা পয়সার হিসেব নিকেশ সব তাঁর হাতে। হায়াত সাহেব না থাকলে তাঁর দায়িত্বে চলে ফার্ম। সাংঘাতিক বিশ্বাসী লোক। এতকাল ধরে হায়াত সাহেবের সঙ্গে আছেন আজ পর্যন্ত কোন কাজে তার কোন ত্রুটি ধরা যায়নি। একটি পয়সার গরমিল হয়নি কখনও। সকালবেলা ঠিক সময়ে অফিসে আসেন। কাজ থাকলে ছুটির পরও বসে বসে কাজ করেন। হাতের কাজ ফেলে রেখে কখনও বাড়ি যান না। অবশ্য বাড়ি ফেরার ব্যাপারে রায় বাবুর আগ্রহ বরাবরই খুব কম। কারণ তিনি চিরকুমার। বয়স হায়াত সাহেবের চে বেশি হবে। থাকেন ছোট বোনের সংসারে। ভাগ্নে ভাগ্নিরা তাঁর প্রাণ। টাকা পয়সা যা রোজগার করেন সবই বোনের সংসারে ব্যয় করেন, ভাগ্নে ভাগ্নিদের পেছনে ব্যয় করেন। হায়াত সাহেবের ফার্মে কোন নতুন স্টাফ জয়েন করলে হায়াত সাহেব সরাসরি তাকে রায়বাবুর হাওলা করে দেন। দিন সাতেকের মধ্যে রায়বাবু তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে উপযুক্ত করে তোলেন। কিভাবে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, চিঠিপত্র কিভাবে লিখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। গতকাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওমরকেও রায়বাবুর হাওলা করে দিয়েছিলেন হায়াত সাহেব—রায়বাবু, এই ছেলেটির নাম ওমর ফারুখ। এক্সিকিউটিভের কাজ করবে। আগে কখনও এ লাইনে কাজ করেনি। সাতদিন সময় দিলাম, মানুষ করে দিন। রায়বাবু হাসিমুখে বলেছেন, চেষ্টা করব। কাল বিকেল পর্যন্ত ওমরকে নিয়ে তারপর বসেছেন রায়বাবু। আজ সকাল থেকেও বসেছেন। হায়াত সাহেব অফিসে ঢুকে দেখতে পেলেন রায়বাবু গভীর আগ্রহ নিয়ে কি একটা ব্যাপার বোঝাচ্ছেন ওমরকে। ওমর বাধ্যছাত্রের মতো বোঝার চেষ্টা করছে। মাঝে মধ্যে হুঁ হাঁ করছে, মাথা নাড়ছে।
হায়াত সাহেব রায়বাবুর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে রায়বাবু এবং ওমর দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। ওমর খুবই বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দিল। সালামের জবাব

দিয়ে হায়াত সাহেব রায়বাবুর দিকে তাকালেন। হাসিমুখে বললেন, কি অবস্থা? সাতদিন শিখতে পারবে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রায়বাবু বললেন, মনে হয় পারবে। আগ্রহ আছে, চেষ্টা আছে।

গুড। ভেরি গুড।

তারপর ওমরের দিকে তাকালেন হায়াত সাহেব। তুমি একটু আমার রুমে আস। কথা আছে।

জ্বী স্যার। এক্ষুণি আসছি।

হায়াত সাহেবের পিছু পিছ তাঁর রুমে এসে ঢুকল ওমর।

নিজের চেয়ারে বসে হায়াত সাহেব বললেন, বস।

ওমর নরম ভঙ্গিতে বসল। বসে মাথা নিচু করে রাখল।

হায়াত সাহেবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিয়ন এয়ারকুলার চালিয়ে দিয়েছে। তবে রুমটা এখনও তেমন ঠাণ্ডা হয়নি। গাড়ি থেকে নেমে এই এটুকু পথ হেঁটে এসে হাঁসফাঁস করছেন হায়াত সাহেব। ঘাড় গলা ঘামে ভিজে গেছে। রিভলবিং চেয়ারের পেছনে রাখা হালকা সবুজ রঙের তোয়ালে ঘাড় গলা মুছলেন তিনি। তারপর ওমরের চোখের দিকে তাকালেন। সরল গলায় বললেন, কি হয়েছে ওমর?

কথাটা যেন বুঝতে পারল না ওমর এমন ভঙ্গিতে বলল, কোথায় কি হয়েছে স্যার?

আমাদের বাড়িতে?

ওমর কথা বলল না, মাথা নিচু করে বসে রইল।

হায়াত সাহেব বললেন, তুলিকে তুমি সব বুঝিয়ে বলবে তো! বললে না কেন?

যেন তুলি নামটা জীবনে প্রথম শুনল ওমর এমন ভঙ্গিতে বলল, তুলি কে স্যার?

আমার মেয়ে, আমার একমাত্র মেয়ে, যার সঙ্গে সকালবেলা তোমার দেখা হয়েছিল।

ও। কিন্তু উনি আমাকে কোন কথা বলার সুযোগই দেননি।

সুযোগ তুমি করে নিতে। তুমি একটা স্মার্ট ছেলে!

কিভাবে করব স্যার?

আরে তুমি যখন দেখলে একটি মেয়ে অবিরাম তোমাকে বলে যাচ্ছে, কোন না কোন সময় সে তো থামবে সেই সুযোগে বলতে। এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

ওমর মাথা নিচু করে বলল, আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম স্যার।

হায়াত সাহেব হাসলেন। তাই বল। নার্ভাস হয়েছিলে।

উনি কথা বলেন, বেশ রাগী ভঙ্গিতে।

কথাটা বুঝতে পারলেন না হায়াত সাহেব। অবাক হলেন। উনিটা আবার কে?

তারপর ঠা ঠা করে হাসলেন। ও তুলির কথা বলছ! আরে ওকে আপনি তিনি করবার দরকার নেই। তোমার চে চার পাঁচ বছরের ছোট হবে। বিএ পড়ে। একেবারে পুঁচকে মেয়ে। একটু মোটা ধাঁচের বলে বড় সড় দেখায়।

একটু থেমে সামান্য চিন্তিত ভঙ্গিতে হায়াত সাহেব বললেন, কিন্তু তুলি তো তেমন রাগী ভঙ্গিতে কখনও কথা বলে না। তোমার সঙ্গে কেন বলল! হয়ত রাগী ভঙ্গিতে বলেনি,

হয়ত তুমি ভুল বুঝেছ। তুলি দেখতে আমার মতো, মানে সামান্য মোটা, কালো, এই ধরনের মানুষরা ভালভাবে কথা বললেও অনেক সময় মনে হয় তারা রাগ করে কথা বলছে। কালো এবং মোটা মানুষদের নানা প্রকার সমস্যা।

ওমরের প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল, না না স্যার তুলি তেমন মোটা নয়। যেটুকু মোটা ওটুকু তাকে মানিয়ে গেছে। আর কালো বলছেন কেন! সে তো শ্যামলা। চেহারাটি বেশ সুন্দর। দেখতে ভাল লাগে।

মুখে এসে যাওয়া কথা আটকে রাখল ওমর। রেখে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল। আমি কিছু মনে করিনি স্যার।

মনে করলেও এখন আর কিছু করার নেই। যা হাওয়ার তা হয়ে গেছে, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অবশ্য ভুলটা তুলির নয়, ভুলটা আমার। কাল বিকেলেই আমার উচিত ছিল তুলির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া।

ওমর নিখুঁত অভিনেতার মতো করে বলল, উনি কি তখন বাড়ি ছিলেন না?

আমরা যখন বাড়ি গেলাম তখন ছিল না। কলেজে ছিল। আরজু মানে তুলির আম্মা যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছেন তখন ফিরেছে। তারপর তুলি অবশ্য আর নিচে নামেনি।

একটু থেমে হায়াত সাহেব বললেন, তোমার আন্টি মানে তুলির মা খুব রাগ করলেন।

কার সঙ্গে?

আমার সঙ্গে, তুলির সঙ্গে।

কেন?

এই যে তুমি এভাবে চলে এসেছ, এজন্য।

আন্টি মানুষ হিসেবে খুব ভাল। আপনারা সবাই আসলে ভাল। আমি বাড়ি গিয়ে আন্টিকে বলব আমি কিছু মনে করিনি। তুলি ভুল করে অমন করেছে। আর আমি স্যার একটু অন্যরকম নীতি নিয়ে চলি। আমাকে যে যত দুঃখ দিক, বেদনা দিক আমি তার ওপর রাগ করি না। বরং হাসি মুখেই তার সঙ্গে কথা বলি। আমাকে কেউ পর ভাবলেও আমি তাকে আপনই ভাবি। আপনারা এসব নিয়ে উতলা হবেন না। এ এমন কোন ব্যাপার নয়। আপনার বাড়ি থেকে অফিসে হেঁটে আসতে আসতেই আমি ওসব ভুলে গেছি।

হায়াত সাহেব চমকালেন। বাড়ি থেকে তুমি হেঁটে অফিসে এসেছ? কেন?

এমনি।

তারপরই মাথা নিচু করল ওমর। ওমরকে মাথা নিচু করতে দেখে যা বোঝার বুঝে গেলেন হায়াত সাহেব। তবু বললেন, বাড়ি থেকে অফিস বেশ দূরে আমার। এতটা পথ তুমি হেঁটে এলে!

ওমর মাথা তুলল না। বলল, হাঁটতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি স্যার। আমি বেশ হাঁটতে পারি। তাছাড়া সকালবেলা হাঁটতে ভাল লাগে। সকালবেলা হাঁটলে শরীর ভাল থাকে।

যখন তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছ তখন অত সকাল নয়। তখন হাঁটতে অত ভাল লাগবার কথা নয়। বেশ রোদ উঠে যাওয়ার কথা। ওসময় হাঁটলে শরীর আরও খারাপ

করবে।
ওমর কথা বলল না।
হায়াত সাহেব বললেন, নাশতা কোথায় করলে? অফিসে? কি খেলে?
মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে হায়াত সাহেবের দিকে তাকাল ওমর। নরম দুঃখী গলায় বলল, নাশতা করিনি।
হায়াত সাহেব আবার চমকালেন। কেন?
আমার স্যার বাইরের খাবার খেতে একদম ভাল লাগে না। ঢাকায় আসার পর থেকেই খাচ্ছি তো, খুব অভক্তি লাগে। বমি পায়।
তার মানে এখনও তুমি না খেয়ে আছ ?
আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমার একদম খিদে পায়নি।
এটা ঠিক নয়। শরীর খারাপ হবে। এক কাজ করবে, তোমার আন্টি অবশ্য আজই আমাকে বলেছেন কাল থেকে বক্সে করে বাড়ি থেকে তোমার খাবার দিয়ে দেবেন, খাবারটা তুমি অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। হেজিটেট করবে না। সকালবেলা আর রাতেরবেলা তো বাড়িতেই খাবে। ভাববে ওটা তোমার নিজের বাড়ি। তুমি তোমার মা বাবার সংসারেই আছ। একদম নিজের মতো করে চলবে। কোন অসুবিধা নেই। বোঝেনি বলে তুলি তোমার সঙ্গে আজ একটা ঝামেলা করেছে, ও ঠিক হয়ে যাবে। তুলি খুব ভাল মেয়ে। আমি এবং তোমার আন্টি ইতিমধ্যেই তুলিকে সব বুঝিয়েছি। আর একটা কাজ করবে, আমি রায়বাবুকে বলে দিচ্ছি, হাজারখানেক টাকা এডভান্স দিয়ে দেবেন তোমাকে। ওটা তোমার পকেট খরচ। টাকাটা নিয়ে এখুনি বাড়ি চলে যাবে। আজ আর অফিস করবার দরকার নেই। বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে রেষ্ট নাও। টেলিফোনে আমি তোমার আন্টিকে বলে দিচ্ছি। যাও, এক্ষুণি যাও।
ওমর চোখ তুলে হায়াত সাহেবের দিকে তাকাল। কোন ফাঁকে জলে চোখ ভরে এসেছে তার। সেই ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেমন করে উঠল হায়াত সাহেবের। কেন যেন ওমরের এই চোখ সহ্য করতে পারলেন না তিনি। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, মন খারাপ কর না। মানুষের জীবনে কতকিছু হয়। তোমার সম্পর্কে তোমার আন্টির কাছ থেকে দু'একটি কথা আমি শুনেছি। শুনে যা বোঝার বুঝেছি। হয় অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ তুমি নয় গভীর কোন দুঃখ পেয়ে। এসব এক সময় ঠিক হয়ে যাবে।
দুহাতে চোখ মুছে ওমর বলল, না স্যার কোনদিনও ঠিক হবে না, আপনি জানেন না, আপনারা কেউ কিছু জানেন না। এই কষ্টের কথা আমি কাউকে বলতে পারি না। কিছুতেই বলতে পারি না। আমার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বুক ফেটে যায়।
ওমরকে চোখ মুছতে দেখে বেশ বিব্রত হয়ে গেলেন হায়াত সাহেব। নিজেকে সামলে আদেশের গলায় তিনি বললেন, যাও রায়বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি যাও। আমি তোমার আন্টিকে বলে দিচ্ছি।
হায়াত সাহেব ফোন তুললেন।

brommochari@yahoo.com

সেই যখন আমি প্রথম চোখ মেলেছিলাম তখন থেকেই আমি জানি আমি
যেখানে আছি সেখানে আমার সত্যি ঠাঁই নয়, বরং সেখানে যেখানে আমি নেই,
যেখানে আমি কখনও ছিলাম না। কোথাও নিশ্চয়ই আছে এক শূন্যস্থান, আর সেই
শূন্য ভরে উঠবে আমায় দিয়েই ...

❒ ওক্তাভিয়ো পাজ

কিচেনের দিকে তাকিয়ে আরজু বললেন, কি হল বুয়া, এত দেরি করছ কেন? বললাম যে তাড়াতাড়ি কর। তরকারি গরম করতে কতক্ষণ লাগে তোমার?
ওমর হাসি মুখে বলল, করুক আস্তে আস্তে। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।
তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে? সকাল থেকে কিছু খাওনি।
না খেলেও খিদে আমার পায়নি। বিশ্বাস করুন।
আরজু বেশ অবাক হলেন। কেন খিদে পাবে না কেন? এখন দেড়টা বাজে। সকাল থেকে না খেয়ে থাকা একজন মানুষের এতক্ষণে খিদে পাবে না কেন?
আমার সত্যি পায়নি।
খিদে না পাওয়া শরীরের জন্য ভাল নয়। খুব খারাপ। পরে এক সময় টের পাবে ভেতরে ভেতরে ধ্বংস হয়ে গেছে শরীর।
বুয়া তখন তরকারি পেয়ালা এনে টেবিলের ওপর রাখল। প্লেট ট্রেট আগেই সাজিয়ে রেখেছিলেন আরজু। বুয়া তরকারি নিয়ে আসতেই ওমরের প্লেটে ভাত তুলে দিলেন, তরকারি তুলে দিলেন। শুরু কর। ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওমর বলল, আপনি খেয়েছেন?
হ্যাঁ তুমি আসার আগেই খেয়ে নিয়েছি। আমি একটার মধ্যে খেয়ে ফেলি। একা একা খেতে হয় তো! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলি। তারপর শুয়ে শুয়ে বই পড়ি। কোন কাজ থাকে না।
ওমর একটু অবাক হল। একা একা খেতে হয় কেন?
আরজু হাসলেন। আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। তোমার স্যার থাকেন অফিসে, তুলি থাকে কলেজে। ছুটিছাটার দিন ছাড়া দুপুরের খাবার একসঙ্গে আমাদের খাওয়াই হয় না। তবে রাতের খাবারটা একসঙ্গে খাই। তখন তো তিনজনই আমরা বাড়িতে।
ওমর খেতে খেতে বলল, কাল তো তা মনে হল না। খাওয়ার সময় কাউকেই দেখিনি।
আরজু আবার হাসলেন। কালকের ব্যাপারটা অন্যরকম। তোমাকে খুলেই বলি। পুরো ঘটনাটা ওমরকে তারপর খুলে বললেন আরজু। শুনে ওমর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

ফ্যালফ্যাল করে খানিক তাকিয়ে রইল আরজুর দিকে তারপর হেসে ফেলল। স্যার তো খুব মজার মানুষ। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছেন। বেশ মজা।
আরজু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কিন্তু এই ধরনের মজা ঠিক নয়। এই ধরনের মজা কখনও কখনও অযথা ঝামেলা সৃষ্টি করে। আজ সকালে তুলি তোমার সঙ্গে যা করল এটা ঠিক হয়নি। এটা তোমার স্যারের মজা করার জন্যই হল। তোমার কথা ভেবে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। আমার খুব মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তোমার স্যার এবং তুলির সঙ্গে খুব রাগারাগি করলাম। মেয়েটাও হয়েছে ওর বাবার মতোই। দেখতেও বাবার মতো, স্বভাব টভাবও বাবার মতো। ওরা দুজন এক রকম আর আমি আরেক রকম। ওদের মজার জন্য মানুষ কষ্ট পাবে এ আমি ভাবতেই পারি না।
ওমর হাসি মুখে বলল, ওই নিয়ে আপনারা আর ভাববেন না। যা হবার হয়ে গেছে। আমি কিছু মনে করিনি।
ওমরের প্লেটে আরেক চামচ ভাত তুলে দিলেন আরজু। ওমর একেবারে হা হা করে উঠল। আর না, আর না। এতটা আমি খেতে পারবনা। পেট ফেটে যাবে।
আরেক টুকরো মাছ তুলে দিলেন আরজু। খাও। এইটুকু খেলে কিছু হবে না। তুমি এত কম খাও কেন? ছেলেরা এত কম খায়! যে ধরনের পরিশ্রম করবে, কম খেলে শরীর টিকবে না।
ওমর ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খাওয়া দাওয়ার প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা আছে। খেতে আমার ভাল লাগে না।
আরজু হাসলেন। কেন বল তো?
ছোটবেলা থেকে মা আমাকে এত জোর করে করে খাওয়াতেন। আমি খেতে চাইতাম না। আমাদের বাড়িটা বিশাল। পুরনো আমলের জমিদার বাড়ি তো। ব্রহ্মপুত্রের তীরে। সামনে খুব বড় লন বাড়িটির, অনেকগুলো রুম। খাওয়ায় সময় এক রুম থেকে আরেক রুমে ছুটে যেতাম আমি। কখনও কখনও বাড়ির লনেও ছুটে যেতাম। প্লেট হাতে মা ছুটে যেতেন পিছু পিছু। জোর করে কোন না কোনভাবে ঠিকই খাওয়াতেন আমাকে। সেই থেকে খাওয়া দাওয়ার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে আমার। আমার সহজে খিদেই পায় না, খেতেই ইচ্ছে করে না আমার। সবই হয়েছে আমার মায়ের জন্য।
কথা বলতে বলতে কেমন উদাস হয়ে গেল ওমর, আনমনা হয়ে গেল।
আরজু তাকিয়ে ছিলেন ওমরের দিকে। ওমরের কথা শুনতে শুনতে তিনিও বুঝি আনমনা হয়েছিলেন। ওমর থামতেই চোখের চশমা ওপর দিকে ঠেলে দিলেন। মায়েরা এমনই হয়। খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পিছু পিছু প্রায় সব মাই দৌড়াদৌড়ি করে।
ওমর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপরও আমার মা ছিলেন অন্যরকম। এত ভাল মানুষকে মানুষ বাসতে পারে আমার মাকে না দেখলে কখনও তা বোঝা হত না। আমি ছিলাম আমার মায়ের জান, আত্মা। চোখের মণি, স্বপ্ন। জীবন কিংবা মৃত্যু। সব, সব।
একহাতে খাবার নাড়াচাড়া করছে ওমর, উদাস দুঃখী গলায় বলছে, চোখ দুটো ছলছল করছে তার, এই দেখে ওমরের মাকে নিয়ে মনের ভেতরে এইমাত্র তৈরি হওয়া প্রশ্নটি আরজু করলেন না। পরিবেশটি অন্যরকম করবার জন্য বললেন, তুমি খুব ইমোশনাল হয়ে গেছ। খাবারটা শেষ কর তারপর তোমার কথা শুনব আমি। খাবার সামনে নিয়ে

এমন করতে নেই।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছলছল ভাবটা কেটে গেল ওমরের। খেতে শুরু করল সে। খেতে খেতে বলল, মায়ের কথা মনে হলে আমার সব কিছু খুব অন্যরকম হয়ে যায়। আমি কোথায় আছি, কি করছি আমার কিছু মনে থাকে না।
ওমরের মা প্রসঙ্গে আরজু কোন কথা বললেন না, বললেন অন্য কথা। ভাত খাওয়ার পর তুমি কি একটু চা খাবে? চায়ের কথা বলব!
প্লেটের খাবার প্রায় শেষ করে এনেছে ওমর। আরজুর কথা শুনে হাসল। আমি চা খাই না।
আরজু হাসলেন। তাই তো! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি তো বলেছ। আসলে তোমার কথা শুনতে শুনতে মনটা খুব অন্যরকম হয়ে গেছে আমার। প্রায়ই আনমনা হয়ে যাচ্ছিলাম।
ওমর বলল, এ সময় হঠাৎ চায়ের কথা মনে হল কেন আপনার ?
খাওয়া শেষ হলে তোমার সঙ্গে বসে কিছু কথা বলব আমি। চা খেতে খেতে বলতে পারলে ভাল হত। বোধহয় এ জন্যই।
আপনি খান। চা খেতে খেতে কথা বলতে কিংবা শুনতে আপনার ভাল লাগবে।
খাওয়া শেষ করে উঠল ওমর। বেসিনে হাত ধুয়ে নরম ভঙ্গিতে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছল, মুখ মুছল। আমি কি বুয়াকে চায়ের কথা বলে আসব?
আরজু বললেন, না থাক। চল আমরা ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলি। নাকি তুমি একটু রেষ্ট নেবে? ঘুমোবে? তাহলে তোমার রুমে যাও।
না না দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস আমার নেই। আপনি তো এসময় রেষ্ট নেন, বই টই পড়েন, আজ পড়বেন না? বরং আপনিই যান। পরে না হয় কথা বলব।
না, ভাবছি আজ দুপুরটা তোমার সঙ্গে কথা বলে কাটাব। কাল থেকে এ পর্যন্ত আবছা আবছা ভাবে দু চারটে কথা তুমি তোমাদের ফ্যামিলি সম্বন্ধে বলেছ, তোমার মা সম্বন্ধে বলেছ কিন্তু কোন কিছুই আমার কাছে তেমন পরিষ্কার হয়নি। তোমার মা সম্পর্কে গতকাল এক রকম বুঝেছিলাম আমি, আজ বুঝলাম আরেক রকম। তোমার মা সম্পর্কে কিছু বলবে? অবশ্য যদি তোমার কোন অসুবিধা না থাকে!
ওমর বিনীত গলায় বলল, আমার কোন অসুবিধা নেই। আপনি শুনতে চাইলে নিশ্চয় বলব। তবে ওসব শুনতে আপনার কেমন লাগবে আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে বলতে আমার খুব ভাল লাগবে। মনে হবে আমার মায়ের মতো আরেকজনের কাছে আমি আমার মায়ের কথা বলছি।
মা শব্দটির ভেতরে যে কোন এক আশ্চর্য ক্ষমতা ঢুকিয়ে দিয়েছে ঈশ্বর, শুনলেই বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। যে কারও সন্তানকেই নিজের সন্তান ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। আরজুও তেমন একটি অনুভূতি হল। মনে হল তার সামনে যে নিরীহ মায়াবী মুখের যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সে অন্য কারও নয়, সে তারই সন্তান। খানিক আগেই যেন কোনকাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে এসেছে। মা তাকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। এখন সেই ছেলের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছেন।

brommochari@yahoo.com

এক পলক আরজুর দিকে তাকিয়ে ওমর বলল, এসব কথা কখনও কাউকে বলতে চাই না আমি। নিজের একান্ত ভেতরের ব্যাপার। শুনে যেন কেউ না ভাবে আমি কারও সহানুভূতির আশায় এসব বলছি। তবে আপনাকে বলব। আমার মায়ের সঙ্গে আপনার কোন ব্যবধান নেই। এত সহজেই যে আমার মা আমার কাছে ফিরে আসবেন আপনাকে না দেখলে আমি তা টের পেতাম না। আমার ভাগ্যটা খুব ভাল যে আপনাকে আমি পেয়েছি, আপনাদেরকে আমি পেয়েছি। নয়ত হঠাৎ করে ঢাকায় এসে যে কোন রকম জীবনে আমি পড়ে যেতাম কে জানে! আমার ভাগ্য আপনাদের কাছে আমাকে টেনে এনেছে। বন্ধুর সঙ্গে ডাবলিং করছি হলে, হঠাৎ করে একটা পেপারে দেখি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন, ঠিকানা মতো গেলাম, স্যারের সঙ্গে দেখা হল। পাঁচ সাত মিনিট কথা বলে চাকরিটা আমাকে দিয়ে দিলেন স্যার। থাকার জায়গা নেই শুনে বাড়ি নিয়ে এলেন। এত সহজে এত কিছু হয় আমার জানা ছিল না। স্যারের ব্যবহারে মনে হল সত্যিকার পিতার মতো একজন মানুষ আমাকে ছায়া দিলেন। আপনাকে দেখে, আপনার ব্যবহারে মনে হল আমার মা আমার কাছে ফিরে এসেছেন। আমি এখন আর একা নই। নিঃসঙ্গ নই।

ওমর যখন কথা বলে, তার গলার স্বর, উচ্চারণ এবং বলার ভঙ্গি কি রকম জাদুকরী একটা পরিবেশ তৈরি করে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনতে হয়। আরজুও শুনছিলেন। ওমর থামতেই মন্ত্রমুগ্ধতা কেটে গেল তাঁর। বললেন, চল ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলি।

আরজুর পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকল ওমর। মুখোমুখি সোফায় বসল, বসেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই শব্দে আরজু কেমন চমকে উঠলেন। ছেলেটি বেশ ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মেজাজের দিক দিয়ে রোমান্টিক কিন্তু বাস্তবে দুঃখী মানুষেরা ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওমরকে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে সে রোমান্টিক এবং দুঃখী। এই ধরনের মানুষ খুব সহজেই অন্যের সহানুভূতি, ভালবাসা এবং মায়া মমতা আদায় করতে পারে। ওমর যেমন পারছে। নাকি নিজের ছেলে নেই বলে ওমরের জন্য এতটা ভালবাসা তৈরি হয়েছে তার। আরজু বললেন, গতকাল তুমি বললে তুমি তোমার মায়ের জন্য বাড়ি ছেড়েছ, আজ তোমার কথা শুনে মনে হল, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মায়ের দিক থেকে তোমার সমস্যাটা কি! কি হয়েছে তোমার মায়ের!

আরজুর চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখের গলায় ওমর বলল, আমার মা আর নেই। আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না আরজু। বললেন, কোথায়?

এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে মানুষ আর কখনও ফিরে আসে না।

আরজু একবারে নিভে গেলেন। হঠাৎ করেই দুহাতে কেউ তাঁর গলা টিপে ধরেছে, যেন হঠাৎ করেই বাকরুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে তাঁকে। করুণ মুখ করে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ওমর আর তাঁর দিকে তাকাল না, মুখটা সামান্য উঁচু করে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ ছেচল্লিশ দিন আমার মা মারা গেছেন। একটানা দুবছর বিছানায় পড়েছিলেন, দুটো বছর প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছেন, তারপর মারা গেলেন।

প্রাথমিক ধাক্কাটা ততক্ষণে কাটিয়ে ফেলেছেন আরজু। এই ধরনের সংবাদে হঠাৎ করে গলা বুজে আসে তাঁর। এখনও এসেছিল। সামান্য গলা খাঁকারি দিলেন তিনি। বুজে

আসা গলা পরিষ্কার করে বললেন, কি অসুখ ছিল?

প্রেসার ছিল। দুবছর আগে আমার এক দূর সম্পর্কের খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। বিকেল বেলা। চারতলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠার পর স্ট্রোক করল। ওরা সময় মত নার্সিংহোমে নিতে পারেনি। আমাদের বাড়িতে খবর এল। আমরা সবাই ছুটোছুটি করে গেলাম। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল। মার জ্ঞান ফিরল আটচল্লিশ ঘন্টা পর কিন্তু তাঁর ডান দিকটা প্যারালাইসড হয়ে গেছে। পরিষ্কার করে কথা বলতে পারেন না। সেই যে বিছানায় পড়লেন মা, তারপর থেকে বিছানায়ই ছিলেন। দিনে দিনে এমন একটা অবস্থা হল মা যেন হয়ে উঠলেন সংসারের উটকো একটা ঝামেলা। যাঁর সংসার তিনিই হয়ে গেলেন সংসারের বাড়তি মানুষ। বাবা রাজনীতি করা মানুষ, সংসার উদাসী এবং নির্মম ধরনের। মানুষের জন্য একদমই মায়া মমতা নেই তাঁর। নিজের প্রয়োজন ছাড়া, সুখ সুবিধে এবং ভাল মন্দ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। প্রচণ্ড স্বার্থপর লোক। নিজের ভালর জন্য মানুষ খুন করতেও তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না।

ওমর আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার ভাবতে অবাক লাগে আমার বাবার মতো মানুষ রাজনীতি করেন। সাধারণ মানুষ নিয়ে ভাবেন। তাদের সুখ দুঃখ এবং আনন্দ বেদনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যে লোক এতটা স্বার্থপর এবং নির্মম সে কেমন করে ভাবে অন্যের সুখ দুঃখের কথা! নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু যার মাথায় নেই সে কেমন করে দেখবে অন্যের স্বার্থ! আমার বাবা রাজনীতি করছে নিজের জন্য। যাদের জন্য করার কথা, যাদেরকে পুঁজি করে তার রাজনীতি, সাধারণ মানুষ, জনগণ তাদের কথা সে কখনও ভাবে না। আর এত খারাপ ব্যবহার যে মানুষ মানুষের সঙ্গে করতে পারে আমার বাবাকে না দেখলে আমি কখনও তা বুঝতাম না। উঠতে বসতে গালাগাল করছে লোককে, সে কি বিশ্রী গালাগাল, আর চড় থাপড় লাথি তো আছেই। একদম সিনেমার ভিলেনদের মতো চরিত্র।

বাবার কথা বলতে মুখে এক ধরনের রাগ এবং ঘৃণা ফুটে উঠেছে ওমরের। কথা শুরু করেছিল বেশ সম্মানের সঙ্গে, আপনি তিনি করছিল, কোন ফাঁকে সেই সম্মানবোধ উধাও হয়ে গেছে। ওমর হয়ত তা টের পায়নি। আরজু পেয়েছেন। হাসি হাসি মুখ করে তিনি বললেন, তুমি বোধহয় তোমার বাবার ওপর খুব রেগে আছ!

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাল ওমর। আরজুর মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, সরি, আমি একটু বেশি রেগে গেছি। বাবার কথা বলতে শুরু করলে কোন ফাঁকে যে এমন হয় আমার, আমি একদম তা বুঝতে পারি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

আরে না না, মনে করব কেন! তুমি বল। সব শোনা দরকার আমার।

রাজনীতি করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে বাবা। কন্ট্রাক্টরি তো আছেই, ট্রান্সপোর্টের বিজনেস, বাড়ি দোকান, মাসে দশ বারো লক্ষ টাকার মতো ইনকাম। ভাবা যায় সেই বাবার একমাত্র ছেলে আমি, আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, মানে বাধ্য হয়েছি আসতে। সামান্য আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরি নিতে হয়েছে। তাও ভাগ্য ভাল আপনাদের মতো মানুষের কাছে এসে পড়েছি, বেঁচে গেছি। নয়ত কি রকম স্ট্রাগল যে আমাকে করতে হত কে জানে! পথের ভিখিরির মতো অবস্থা হয়ত হত আমার। খেতে পেতাম না, পরতে পেতাম না। থাকার জায়গা থাকত না। আর চাকরি

বাকরির তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার চেয়ে কত যোগ্য লোক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় চাকরি!

আরজু নরম গলায় বললেন, যা বলছিলে তাই বল। তোমাদের ফ্যামিলির কথা তোমার মায়ের কথা। আমাদের প্রসঙ্গ থাক।

মায়ের কথা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওমর আবার আগের ওমর হয়ে গেল। দুঃখী উদাস অভিমানী। চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তার। আমার মা এভাবে মরে যেতেন না। আমার মাকে মরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। খুন করা হয়েছে আমার মাকে।

আরজু চমকালেন। বল কি! খুন করা হয়েছে মানে!

জ্বী। এ এক প্রকার খুনই। প্রপার ট্রিটম্যান্ট পেলে, চিকিৎসার জন্য বিদেশ টিদেশ নিয়ে গেলে আমার মা মারা যেতেন না, ভাল হয়ে উঠতেন। বাবা চাননি মা ভাল হউক। মা সেরে উঠুক। সে চেয়েছে মরে যাক। মা মরে গেলে বাবার সব পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তার কোন সমস্যা থাকে না।

এসব কথা বুঝতে পারলেন না আরজু। চশমাটা নাকের দিকে নেমে এসেছিল, সামান্য ঠেলা দিয়ে ওপরে তুললেন, সরাসরি ওমরের মুখের দিকে তাকালেন।

ওমর বলল, বাবার সঙ্গে কখনই তেমন মিল হয়নি মার। আমার মা ছিলেন এক জগতের মানুষ বাবা আরেক। মা ভালবাসতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা। নরম, সুন্দর জীবন। কোন উগ্রতা নয়, বাড়াবাড়ি নয়। মানুষকে কেমন করে দুঃখ দিতে হয়, অবহেলা করতে হয় আমার মা তা জানতেন না। আর বাবা সম্পূর্ণ এর উল্টো। সে টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। প্রেম ভালবাসা মায়া মমতা আবেগ বলে যে মধুর ব্যাপারগুলো এই পৃথিবীতে আছে যে ব্যাপারগুলো মানুষের জীবনকে সুন্দর করে সেসব ব্যাপারের ধার দিয়েও আমার বাবা কখনও হেঁটে যায়নি। ফলে জীবনটা তাদের শুরুই হয়েছিল অসমভাবে। দুই ভুবনের দুই মানুষ বসবাস করতে শুরু করেছিল এক ছাদের তলায়। এমনিতেই তীব্র মতবিরোধ দুজনার তার ওপরে আমি হয়েছি একেবারেই মায়ের মতো, যখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল তখন থেকে মাকে যেমন দেখতে পারে না বাবা আমাকেও দেখতে পারে না। মায়ের মতো আমিও হয়ে গেলাম তার শত্রু। দুচোখের শূল।

কথা বলতে বলতে আরজুর দিকে তাকাল ওমর। লাজুক মুখ করে বলল, আপনার মনে হয় বোর লাগছে আন্টি!

আরজু প্রায় হা হা করে উঠলেন। না, না, তা লাগছে না। তুমি বল। এসব আমার জানা দরকার। আমি এসব জানতে চাই। শুনতে আমার ভাল লাগছে।

ওমর বলল, শুধু টাকা পয়সার লোভই প্রধান ত্রুটি নয় আমার বাবার চরিত্রের, অন্য আর একটি ব্যাপারও ছিল তার, মা অসুস্থ হওয়ার অনেক পরে আমরা তা জেনেছি। আন্টি, ওই ঘটনাটি জানার পর যে কদিন বেঁচে ছিলেন, আমার মার কখনও চোখ শুকনো ছিল না। সারাক্ষণ কেঁদেছেন তিনি। কিছু মুখে দিতে চাননি, একটা মুহূর্ত ঘুমোননি। মুখের কথা তো পরিষ্কার হত না, কান্নার শব্দটা যে কি অসহায় শোনাত! মনে হত পৃথিবীতে এই রকম দুঃখ বুঝি আমার মা ছাড়া আর কেউ কখনও পায়নি। গভীর দুঃখের এক বোবা প্রাণ যেন কাঁদছে। গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে।

আরজু লক্ষ্য করলেন ওমরের চোখ জলে ভরে গেছে। চোখের জল সামলাতে অন্যদিকে তাকিয়েছে সে। মাথা নিচু করেছে। মুখে অদ্ভুত এক দুঃখের ছায়া পড়েছে।

এই সব মুহূর্তে কি করার থাকে মানুষের! কিভাবে সান্ত্বনা দেয়া যায় গভীর দুঃখ পাওয়া মানুষকে! আরজু ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। হঠাৎ করেই বললেন, তোমার বাবা কি আবার বিয়ে করেছেন? এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত এই রকমই হয়।

শিশুর মতো ডলে চোখ মুছতে লাগল ওমর। জড়ান গলায় বলল, হ্যাঁ। তবে এখন নয়, বেশ অনেক দিন আগেই।

তোমার মা অসুস্থ হওয়ার পর?

না অনেক আগে। বেশ অনেক আগে।

বল কি!

হ্যাঁ, আমরা কেউ তা টের পাইনি। বাবা প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকত। বাড়িতে বলে যেত রাজনীতির কাজে শহরের বাইরে যাচ্ছে কিন্তু গিয়ে থাকত তার অন্য স্ত্রীর কাছে।

কোথায়? ময়মনসিংহেই?

না ঢাকায়। উত্তরায় বিরাট বাড়ি করে দিয়েছে সেই মহিলাকে। গাড়ি, দারোয়ান, সাংঘাতিক অবস্থা। মহিলা আছেন রাজরাণীর মতো।

বাচ্চা কাচ্চা হয়নি?

হয়েছে। একটি মেয়ে। আট দশ বছর বয়স হবে। গুলশানের ওদিককার কোন একটি স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। মাসে এক দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় সেই মহিলার। সাংঘাতিক হাই ফাই জীবন। উগ্র ধরনের জীবন।

একটু থেমে ওমর বলল, এসব জানার পর আমার মা অভিমান করে মরে গেছে। ওই মহিলার কারণে বাবা কখনও আমার মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। মাকে ভেবেছে পথের কাঁটা। চেয়েছে পথের কাঁটা যত দ্রুত সরে যায়। মার দেখাশোনার জন্য সারাক্ষণের একটি আয়া ছিল। মৃত্যুর মাসখানেক আগে অকারণে সেই আয়াটিকে বিদায় করে দিল বাবা। আন্টি আপনি ভাবতে পারেন তারপর থেকে যতদিন বেঁচে ছিলেন আমি সারাক্ষণ থেকেছি আমার মায়ের সঙ্গে। এমনিতেই আমি ছিলাম আমার মায়ের জান। আমাকে ছাড়া আমার মা আর কিছু বোঝেনি। সেই মা যখন এরকম দুঃখ পেয়ে মারা গেল, ভেতরে ভেতরে আমি একদম শেষ হয়ে গেলাম। বাবার ওপর যে কি ঘৃণা জন্মাল! ওই বাড়ির ওপর থেকে, ওই শহরের ওপর থেকে আমার মন উঠে গেল। চল্লিশটা দিন অতিকষ্টে ওই বাড়িতে আমি তারপর কাটিয়েছি। এক চল্লিশ দিনের দিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আন্টি আমার মা-ই যখন নেই তখন ওই বাড়িতে আমি কেন থাকব! যে বাড়ির অধিকর্তা অবহেলা করে, ইচ্ছে করে আমার মাকে মেরে ফেলেছে সেই বাড়িতে আমি কেন থাকব, সেই মানুষের কাছে আমি কেন থাকব! আমি কখনও আর ওই বাড়িতে ফিরে যাব না। আমার বাবার কাছে আমি কখনও ফিরে যাব না। তার পরিচয়ও আমি কোথাও দেব না। আমার কোন টাকা পয়সার লোভ নেই, আমার কোন সম্পদের লোভ নেই। আমার জীবন ছিল আমার মা। সেই মাই যখন নেই তখন আমার আর কিচ্ছু চাই না। কাউকে চাই না।

brommochari@yahoo.com

আবার কেঁদে ফেলল ওমর। নিঃশব্দে গাল বেয়ে কান্না নামল তার।

চোখ থেকে চশমা খুলে আঁচলে কাচ মুছতে লাগলেন আরজু। মোছা শেষ করে চশমাটা আবার চোখে পরলেন। তারপর বললেন, তোমার কথা শুনে আমি সব বুঝেছি। মানুষের জীবনে যে কত ঘটনা থাকে! অবশ্য প্রথমদিনই তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিল বেশ বড় রকমের কোন দুঃখ পেয়ে বাড়ি ছেড়েছ তুমি। তবে সেই দুঃখটা যে এই রকম, এতটা আমি কল্পনাও করিনি। এ আমার কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে।

দুহাতে মুখ ঢেকে ওমর তখন হু হু করে কাঁদছে। আরজু এক পলক ওমরের দিকে তাকালেন তারপর উঠে গিয়ে তার মাথায় হাত রাখলেন। কেঁদ না, কেঁদ না। মনে কর তোমার মা মারা যাননি, মনে কর তোমার মা বেঁচে আছেন। তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। এই যে তোমার মা। এই যে আমি, আমি তোমার মা।

কেন এভাবে বললেন আরজু, বুঝতে পারলেন না। নিজের কোন ছেলে নেই বলে কি! যে সব মায়ের কোন ছেলে থাকে না, যে মায়েরা ভেতরে ভেতরে একটি ছেলের জন্য কাতর সে মায়েরা কি এমন হন! ওমরের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই কি এসব কথা বেরিয়ে এল আরজুর মুখ থেকে!

আরজুর কথা শুনে ওমর তখন চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো ভেজা তার।

পাথরের মধ্যে পাথর, আর মানুষ, সে কোথায় ছিলো?
হাওয়ার মধ্যে হাওয়া, আর মানুষ, সে কোথায় ছিলো?
সময়ের মধ্যে সময়, আর মানুষ, সে কোথায় ছিলো?

❒ পাবলো নেরুদা

চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিসে গলায় তুলি বলল, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি তো!

নিজের বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে ওমর। তার পরনে এখন বেগুনি রঙের ট্রাউজার আর শাদা ঢোলা গেঞ্জি। গেঞ্জির বুকের এক পাশে সবুজ রঙে রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ আঁকা। আর মাঝখানে পাঁচলাইনের একটি কবিতা।

এই রুমে একটি মাত্র জানালা, জানালাটি বিছানার মাথায় দিকে। একটার ওপর আরেকটা বালিশ দিয়ে, তার ওপর পিঠ, উদাস ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল ওমর। বাইরে এখন বেলা শেষের বিষণ্ণ আলো। আকাশ কি রকম মন খারাপ করা

একটা ভাব ধরেছে। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন নিজের ভেতরই ডুবে আছে ওমর। তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে কিন্তু দেখছে যেন নিজের ভেতরটাকে। কখন তুলি এসে ঢুকেছে তার রুমে টের পায়নি। এজন্য তুলির গলা শুনে সামান্য চমকাল সে। তারপর সোজা হয়ে বসল। ম্লান হেসে বলল, না।

তুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, অভিনয়টা ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছিলেন?

ওমর স্পষ্ট গলায় বলল, না।

তুলি বেশ অবাক হল। কি?

আমি অভিনয় জানি না। কখনও কোথাও করিনি। এবং সে কথা আপনাকে বলেছি।

তুলির বেশ মেজাজ খারাপ হল। গ্রীবা বাঁকিয়ে ওমরের মুখের দিকে তাকাল সে। হুবহু ওমরের ভঙ্গিতে বলল, ইস ঢং। আমি অভিনয় জানি না। কখনও কোথাও করিনি। আমার সঙ্গে এরকম ভাব ধরে কথা বলবেন না। এসব ভাব ভঙ্গি আমি পছন্দ করি না।

তুলির চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল ওমর। আমিও পছন্দ করি না।

তাহলে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন কেন?

আমি কি খুব খারাপ ভাবে বলছি?

খারাপ ভাবেই বলছেন। কলেজ থেকে ফিরে কত রকম কায়দা করে আমি ব্যাপারটা জানতে এলাম আর উনি আমার সঙ্গে ভাব ধরলেন। আপনি খুব খারাপ লোক। পচা লোক।

ওমর কথা বলল না। মুখ ম্লান করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

আড়চোখে ওমরকে দেখল তুলি। দেখে আশ্চর্য ধরনের একটা মায়া লাগল। বুকটা কেমন করে উঠল। নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হল। গলা নরম করে বলল, কলেজে আজ আমার মনই বসেনি। ক্লাশ করেছি ঠিকই, টিচাররা কি পড়িয়েছেন কিছুই মাথায় ঢোকেনি। সারাক্ষণ শুধু আপনার কথা ভেবেছি।

শেষ কথাটা এমনভাবে বলল তুলি, ওমর বেশ চমকাল। চমকে তুলির দিকে তাকাল। ওমরকে ওভাবে তাকাতে দেখে তুলি খুব লজ্জা পেল। নিজের অজান্তেই মাথা নিচু হয়ে গেল তার। লাজুক গলায় বলল, আপনার কথা মনে পড়েছে মানে সকালবেলার কথাগুলো মনে পড়েছে। বাবার ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষ নিলেন আপনি। অফিসে চলে গেলেন। তারপর সব ঠিকঠাক মতো সামলাতে পারছেন কিনা ওসব মনে পড়েছে। অন্য কিছু নয়। অন্য কিছু ভাববেন না।

ওমর বলল, আমি বুঝেছি। আমি অন্য কিছু ভাবিনি। এত সহজে অন্য কিছু ভাবার মন মানসিকতা আমার নেই।

কিন্তু আসল কথাটাই তো বলছেন না।

আসল কথা কোনটা? ও বুঝেছি। আপনার সঙ্গে যেভাবে প্ল্যান করে গেলাম ঠিক ওভাবেই সব হয়েছে। একটুও ভুলভ্রান্তি হয়নি। একটুও অন্যরকম হয়নি।

এদিকে বাড়িতে তো তুলকালাম হয়ে গেল। মা খুব রাগারাগি করলেন বাবার সঙ্গে। আমি চমৎকার অভিনয় করে গেলাম। আমাকে কিছু বলবার স্কোপ তাঁরা পাননি। বাবা যে কি রকম বোকা হয়ে গেলেন! বাবার মুখ দেখে আমার যা হাসি পাচ্ছিল না! কি বলব!

তুলির চোখের দিকে তাকিয়ে ওমর বলল, আপনি খুব ভাল অভিনয় কতে পারেন, না?
মোটামুটি পারি। কলেজ ফাংশানে একক অভিনয় করি আমি। খুব ইচ্ছে ছিল টিভিতে করব কিন্তু আমি যে দেখতে পচা। মোটা, কালো। এই চেহারা নিয়ে টিভিতে গেলে লোকে হাসবে। যত ভাল অভিনয়ই করি জীবনেও পপুলার হতে পারব না।
না তা ঠিক নয়। এমন কোন মোটা আপনি নন। গায়ের রঙও কালো নয় আপনার শ্যামলা। এই রঙটি খুব মিষ্টি রঙ। এই রঙের মানুষরাই দেখতে সাধারণত সুন্দর হয়। আর আপনার চেহারাটাও খুব সুন্দর। আপনি নিজের সম্পর্কে যা বলছেন ভুল বলছেন।
এই ধরনের প্রশংসা জীবনে প্রথম শুনল তুলি। তার ভেতরটা কি রকম যেন এলোমেলো হয়ে গেল। অপলক চোখে ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। এতক্ষণ ধরে বলা সব কথা ভুলে গেল।
ওমর নরম গলায় বলল, তবে অভিনয় জিনিসটা আমার একদম ভাল লাগে না। যারা অভিনয় করে তাদের ভেতরকার আসল ব্যাপারটি সহজে ধরা যায় না। কখন তারা অভিনয় করে, কখন সত্য আচরণ করে বোঝা মুশকিল।
তুলির ইচ্ছে হল সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি আর কখনও অভিনয় করব না কিন্তু কথাটা সে বলল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।
ওমর বলল, স্যার এখনও বাড়ি ফেরেননি?
তুলি চোখ তুলল। ফিরেছেন। কেন আপনি জানেন না? এক সঙ্গে ফেরেননি?
না। আমি দুপুরবেলা বাড়ি চলে এসেছি।
কে?
স্যার জোর করে পাঠিয়ে দিলেন।
তুমি আবার বলল, কেন?
ওমর ম্লান হাসল। থাক ওসব কথা। আপনার কথা বলুন। বাড়ি ফিরে অনেক কষ্ট করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, এসব কি যেন বলছিলেন! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একটু যদি খুলে বলেন! পরিষ্কার করে কথা বলা আমার খুব ভাল লাগে।
কলেজে আমি আজ সারাদিন ছটফট করেছি, কখন ছুটি হবে, কখন বাড়ি ফিরব, কখন আপনার কাছ থেকে সব জানব। বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে মাত্র বসেছি, বাবা এলেন। বাবার আসা মানে অবিরাম গল্প আর হাসি আনন্দ। গতকাল আমি একটা আইডিয়া দিয়েছিলাম বিকেলবেলা খোলা ছাদে বসে চা খাওয়ার, বাবা বললেন আজও বসবেন। নানা রকমভাবে সেটা ম্যানেজ করে নিচে এলাম।
কিন্তু আপনি যে নিচে এসেছেন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আপনাকে তাঁরা খুজবেন না?
মনে হয় না। ভাববে আমি হয়ত আমার রুমে রেস্ট নিচ্ছি। আচ্ছা বাবা কিংবা মা কেউ কিছু বুঝতে পারেনি তো?
না।
তাহলেই ভাল।
কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। যা হওয়ার হয়ে গেছে এই নিয়ে আর কখনও কথা তুলবেন না।

তা না হয় তুললাম না কিন্তু বাবাকে তাহলে বোঝাব কি করে যে তুমি আমার সঙ্গে যে চালাকি করেছ সেই চালাকির উল্টো এরকম একটি চালাকি তোমার সঙ্গে আমি করেছি। তোমার উপযুক্ত মেয়েই আমি।
এখন সেটা করতে গেলে আমি একটু ঝামেলায় পড়ব। আপনার আব্বা আম্মা দুজনেই আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি তাদের সঙ্গে এরকম একটা চালাকি করেছি এটা তাঁদের ভাল লাগবে না। মনে খুব কষ্ট পাবেন।
আপনি কোথায় চালাকি করলেন! চালাকি করলাম আমি।
আইডিয়াটি আমি আপনাকে দিয়েছি এবং আপনার কথা মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি। এসব জানলে আমার ওপর তাঁরা মনক্ষুণ্ন হবেন। আমাকে ভাববেন বাজে ছেলে কিন্তু বাজে ছেলে আমি নই। আপনি বিশ্বেস করবেন করবেন কি না আমি জানি না। আমার মনে পড়ে না আমি কখনও মিথ্যে কথা বলেছি কিনা। মিথ্যে বলতে আমি খুব ঘৃণা বোধ করি। সেই মিথ্যে আমি আজ আপনার জন্য বলেছি। সত্যিকার পিতার মতো একজন মানুষের সঙ্গে বলেছি, সত্যিকার মায়ের মতো একজনের সঙ্গে বলেছি। দয়া করে এই দুজন মানুষের কাছে আপনি আমাকে আর ছোট করবেন না। সকালবেলা আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হল, আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনে আপনাকে আমার এত ভাল লাগল, ওই ভাল লাগার কারণেই কিন্তু আপনাকে আমি আইডিয়া দিলাম, আপনার কথায় রাজি হলাম। তারপর আপনার আব্বা আম্মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে টের পেলাম একটি মিথ্যেকে ঢাকবার জন্য কতগুলো মিথ্যে বলতে হয়। মিথ্যে বলতে বলতে আমি আজ ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। এমনিতেই আমি খুব দুঃখী একজন মানুষ। আমার সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না, জানলে বুঝতেন আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মতো করে বলতে ইচ্ছে করে—
'আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কী মানুষ জন্ম?'
কবিতার লাইন দুটো এত সুন্দর করে আবৃত্তি করল ওমর, মুহূর্তে তুলি ভুলে গেল এতক্ষণ ধরে কি কথা বলেছে ওমর। ঘোর লাগা চোখে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল সে।
ওমর বলল, বলুন এই নিয়ে আপনি আর কথা বলবেন না। বলুন।
তুলি বুঝতে পারল না কোন কথা বলতে তাকে মানা করছে ওমর। তার শুধু মনে হল এই মুহূর্ত থেকে ওমর যা বলবে তাই মেনে নেবে সে। ওমরের কোন কথায় না বলবার ক্ষমতা তার আর নেই।
তুলি স্বপ্নাচ্ছন্নের গলায় বলল, বলব না। আমি কিছু বলব না, কোন কথা বলব না। এই মুহূর্তের আগের সব কথা ভুলে যাব আমি।
তুলির কথা শুনে ওমর কি রকম একটু কেঁপে উঠল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল তুলির মুখের দিকে। তুলি তো তাকিয়ে ছিলই, সেই চোখ সে আর ফেরাতে পারে না। বাইরে এখন দিন শেষের মোহময় আলো কিন্তু ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। এই অন্ধকারে দু'জন মানুষের চোখ পরস্পর পরস্পরের দিকে কেবল তাকিয়ে থাকে। ওমর

brommochari@yahoo.com

বলল, আজ থাক আরেকদিন আমি আপনাকে আমার জীবনের কথা বলব।
এ কথায় তুলি একটু নড়েচড়ে উঠল। ধীর নরম গলায় বলল, আমি শুনেছি। মাকে আপনি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই বাবাকে এবং আমাকে মা সে কথা বলেছেন। ওই দুঃখের কথা আমি আর আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই অন্য কিছু। অন্য কোন কথা।
কি কথা?
কবিতার মতো কিছু কথা। গভীর ভাল লাগার মতো কিছু কথা।
তুলির কথা বুঝেও না বোঝার ভান করল ওমর। বলল, আজকের ঘটনাও কি সব জেনেছেন আপনি?
তুলি চমকাল। আজকের কি ঘটনা।
আমি দুপুরবেলা কেন বাড়ি চলে এলাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
না। কেন এসেছেন আপনি?
স্যার জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।
কেন?
ওই যে সকালবেলা আমি নাশতা করিনি, বাড়ি থেকে হেঁটে অফিসে গেছি।
এবার তুলি একেবারে আঁতকে উঠল। নাশতা করেননি কেন? হেঁটে অফিসে গেছেন কেন?
থাক ওসব আর আপনার শুনবার দরকার নেই।
আমি শুনব। আমাকে আপনি বলুন।
আসলে হয়েছে কি, আপনি তো আন্টির মুখে শুনেছেনই আমি কিভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। টাকা পয়সা পকেটে যা ছিল আগেই খরচ হয়ে গেছে। আজ সকালে আপনার কথা মতো বাড়ি থেকে বেরুবার পর দেখি পকেটে একটি পয়সাও নেই। কি আর করব, হাঁটতে শুরু করলাম। আমার একদম হাঁটার অভ্যেস নেই জানেন। তার ওপর রোদ উঠে গেছে। রোদ আমি একদম সহ্য করতে পারি না। বাড়ি থেকে অফিস তো দূরও অনেক। হাঁটতে এত কষ্ট হচ্ছিল। জীবনে এতটা পথ কখনও হাঁটিনি আমি। অফিসে পৌঁছুবার পর এত ক্লান্ত হলাম, এত খিদে পেল। কিন্তু কি করব বলুন! পকেট খালি। নাশতা করবার পয়সা নেই।
ওমরের কথা শুনতে শুনতে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তুলির। কোন রকমে চোখের জল সামলে সে বলল, ইস কি যে করলাম আমি! কি যে করলাম! আমার এখন নিজের হাত নিজে কামড়াতে ইচ্ছে করছে। নিজের চুল নিজে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আমার এখন, আমার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার এখন সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনি বিশ্বেস করুন, বিশ্বেস করুন আপনি আমার একদম বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। এ আমি কি করলাম!
ওমর বলল, যা হবার হয়ে গেছে। ও কথা আর মনে রাখবেন না। আমি মনে রাখিনি, আপনিও মনে রাখবেন না। মনে রাখলেই মন খারাপ হবে। কষ্ট হবে।
তারপর যেন হঠাৎই খেয়াল হয়েছে এমন গলায় ওমর বলল, আপনি এসেছেন

অনেকক্ষণ হয়েছে কিন্তু।
তুলি বলল, হোক। যা ইচ্ছে হোক।
আপনার বাবা মা আপনাকে খুঁজতে এলে?
কিছু হবে না।
এরকম আবছা অন্ধকার একটি ঘরে আমাদের দু'জনকে দেখলে তারা কিছু ভাবতে পারেন।
ভাবলে ভাববে।
এটা ঠিক নয়। আমাদের মধ্যে এমন কিছু নেই, যদি থাকত তাহলে তাঁরা কিছু ভাবলেও আমাদের মনে করার কিছু থাকত না। কিন্তু এখন ভাবলে আমাদের দু'জনের ওপরই অন্যায় করা হবে। ওই অন্যায়ের স্কোপ তাঁদেরকে আমরা কেন দেব! অকারণে কেউ কোন মিথ্যে ভাবনা ভাববে আমাকে নিয়ে, অন্যরকম ভাববে, এ আমি ভাবতেই পারি না। আমার খুব খারাপ লাগবে।
তুলি এমন চোখ করে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল! তার মনের ভেতর যে কত কথা! কত কথা যে ওমরকে তার বলতে ইচ্ছে করল। এমন সব কথা যে কথা এই জীবনে কখনও কাউকে বলা হয়নি তার। একবার ইচ্ছে হল ওমরকে সে বলে, সরাসরি বলে, যদি আমার মা বাবা কেউ এখন এই রুমে আসেন, যদি তাঁরা কেউ দেখেন, ঘরে আলো নেই, আবছা অন্ধকারে আমরা দু'জন, তাঁরা যা ভাববেন, যেমন করে ভাববেন, তেমন করে নয় আপনি আপনার মতো করে আমার কথা ভাবুন। আপনার ভাবনার কথা আপনার মতো করে আমাকে বলুন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, সুন্দর উচ্চারণে, কবিতার মতো করে বলুন। শুনে দিন এবং রাত্রি একাকার হয়ে যাক আমার। জীবন এবং মৃত্যু একাকার হয়ে যাক। আমি কেবলই বিভোর হই আপনার স্বপ্নে। আমার পৃথিবী আলোকিত হোক আপনার আলোয়। সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আমি যেন চিৎকার করে চারদিকের পৃথিবীকে বলি, ভালবাসি, ভালবাসি।
তুলির চোখের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসল ওমর। আমার এই গেঞ্জিতে, এই যে বুকের কাছে কি লেখা আছে জানেন! লেখা আছে–

পৃথিবীর ভালবাসা এত সত্যি যে,
সূর্যকে আগামীকাল আবার আসতেই হয়।
আমাদের ভালবাসার টানে
তোমাকেও বারবার
আসতেই হবে।

আবৃত্তি শেষ করে কি কথা বলবার জন্য তুলির দিকে তাকাল ওমর। তার আগেই মুখে অনিন্দ্য সুন্দর এক হাসি ফুটে উঠল তুলির। মুহূর্তের জন্য দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। তারপর কোন কথা না বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তুলির কেবল মনে হল জন্মের পর থেকে এই এতকাল তার চারপাশে সবই ছিল, হাওয়া গাছপালা ফুল পাখি প্রজাপতি মা বাবা আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব, কেবল একজন মানুষ ছিল না। মনের মানুষ।

সেই মানুষটি আজ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এত বড় হৃদয় আমার,
নক্ষত্রনিখিল যায় ধরে;
এত সুখী—সবেমাত্র যার
শুরু হলো, সেই প্রেমিকের
ছেড়ে দিতে পারে সে এখনই।

❐ রাইনের মারিয়া রিলকে

শামা তীক্ষ্ণ চোখে তুলির দিকে তাকাল। তোর কি হয়েছে রে?

তুলি কি রকম আনমনা হয়ে আছে। আনমনা হয়ে কি যেন ভাবছে। তবে ভাবনাটা যে বেশ মধুর এবং অন্য ধরনের তুলির মুখ দেখে যে কেউ তা বুঝে যাবে। ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে সে ঠিকই কিন্তু মুখটা গভীর আনন্দে ঝলমল করছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে আছে। কলেজ মাঠের কোণে, বকুল গাছতলার বাঁধান চত্বরে শামার সঙ্গে সে বসে আছে ঠিকই কিন্তু সে যেন এখানে নেই। সে যেন চলে গেছে অন্য কোনখানে। রবীন্দ্রনাথের গানের মতো দূরে কোথায় যেন তার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকের আগে তুলির এরকম চেহারা কখনও দেখেনি শামা। এই ধরনের উদাসীনতা দেখেনি। কি হয়েছে তুলির!

শামা আবার বলল, কি হয়েছে?

শামার কথা শুনে চট করে তার দিকে চোখ ফেরাল তুলি। হাসি মুখে বলল, কি বললি?

শামা অবাক হল। শুনতে পাসনি?

না।

কেন?

কেন পাইনি কি করে বলব!

এখন যে আমি কথা বলছি এসব শুনতে পাচ্ছিস তো?

তুলি আবার হাসল। তা পাচ্ছি।

তাহলে তোর কানে কোন ডিফেক্ট নেই।

কানে ডিফেক্ট থাকবে কেন? এই তুই কি আমাকে বয়রা ভাবছিস?

বয়রা কথাটা বুঝতে পারল না শামা। বলল, বয়রা মানে?

মানে কালা। যারা কানে শোনে না। বয়রাটা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা।

হ্যাঁ, আমি তোকে তাই ভেবেছি। বয়রা ভাবছি।

কেন?

কানের পাশে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোর কি হয়েছে। তুই সে কথা শুনতে পেলি না। দু'বার বললাম, তাও না।

কাল সন্ধ্যে থেকে অনেক কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি, অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যদি তুই বলিস আমি অন্ধ হয়ে গেছি, আমি অন্ধ হয়ে গেছি। যদি তুই বলিস আমি বয়রা হয়ে গেছি, আমি বয়রা হয়ে গেছি।

প্রেমে পড়েছিস নাকি?

প্রেমে পড়লে এমন হয়?

হয়।

তাহলে বোধহয় আমি প্রেমে পড়েছি।

শামা প্রায় লাফিয়ে উঠল। কার?

তুই চিনবি না।

কথাটা এমন নির্বিকার গলায় বলল তুলি, যে উৎসাহ নিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল শামা ঠিক সে রকম উৎসাহ নিয়েই নিভে গেল। মুখ ঝামটে মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলল, আমি যে চিনব না সেটা আমি জানি। আমার চেনা কেউ, তোর মতো ধুমসির সঙ্গে প্রেম করতে যাবে না। তাদের রুচি এত খারাপ নয়।

তুলি বুঝে গেল যেটুকু রাগাবার শামাকে সে রাগিয়ে ফেলেছে। এখন রাগটিকে এরেকটু উসকে দিলে মজা হবে।

অন্যদিকে তাকিয়ে নির্বিকার গলায় তুলি বলল, ধুমসি হলেও লোকে আমাকে তোর চে সুন্দর বলে। দেখিস না আমরা দু'জন একসঙ্গে কোথাও গেলে লোকে শুধু আমার দিকে তাকায়। তোকে একদম পাত্তা দেয় না। কেউ কেউ সরাসরি বলেই ফেলে আপনার বান্ধবীটা দেখতে খুবই বাজে। অতিশয় পচা। এ রকম বাজে চেহারার একটি মেয়ে আপনার বন্ধু হল কি করে? আপনি আয়নায় নিজেকে দেখেন না, আপনি যে এত সুন্দর জানেন না?

যারা এসব বলে সেগুলো গাধা।

হ্যাঁ, এ জন্য গাধাগুলোর প্রেমে আমি কখনও পড়িনি।

কথাটার মানে কি রে? তুই কি আমাকে ইনসাল্ট করছিস?

বুঝতে পারছিস না?

না। এত ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে বলা কথা আমি বুঝি না।

তাহলে করছি না।

কথাটা এমন ভঙ্গিতে বলল তুলি এতক্ষণকার বানান ঝগড়া ভুলে খিলখিল করে হেসে উঠল শামা। শামার হাসি অপূর্ব সুন্দর। যাদের গলার স্বর সুন্দর হয়, উচ্চারণ সুন্দর হয় তাদের হাসিও বুঝি সুন্দর হয়। শামার হাসি শুনলে সব সময়ই এই কথাটা মনে হয় তুলির। এখনও হল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন মানুষের কথাও মনে হল তার। সে ওমর।

ওমরের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে গেল তুলির। চোখ দুটো স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। এই ব্যাপারটি খেয়াল করল শামা। চিবুক নেড়ে দিয়ে কোন কোন শিশুকে যেমন আদর করে মানুষ ঠিক সেই কায়দায় তুলির চিবুক ধরে একটা নাড়া দিল সে। তুই না বললেও আমি বুঝে গেছি। আমি সব বুঝে গেছি।

তুলি মিষ্টি করে হাসল। মুখ দেখে না বুঝলে তুই আর আমার কেমন বন্ধু হলি!

কিন্তু ছেলেটি কে?

ওমর। পুরো নাম ওমর ফারুখ চৌধুরী।

আমি চিনি?

কি জানি!

শামা ভুরু কোঁচকাল। মানে!

তুই কাকে চিনিস না চিনিস আমি কি করে বুঝব!

দু'হাতে তুলির গলা জড়িয়ে ধরল শামা। না না ফাজলামো নয়। আমাকে ঠিকঠাক মতো বল। আমার খুব অস্থির লাগছে।

কি বলব?

আবার!

শামা গাল ফুলাল। আর একটু যদি ফাজলামো করিস আমি উঠে চলে যাব। আড়ি নেব। জীবনেও তোর সঙ্গে কথা বলব না, তোর মুখ দেখব না। সত্যি।

ঠিক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল শামা। কলেজের ব্যাগটা ছিল পাশে ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিল। তবে পা বাড়াবার আগেই তুলি তার কামিজের খুট টেনে ধরল। যেও না জান। বলছি, বস। সব তোমাকে আমি বলছি। তুমি হচ্ছ আমার জান।

জান শব্দটি শামার খুব প্রিয়। যে কোন পরিস্থিতিতে এই শব্দটি শুনলে সে একটু দিশেহারা হয়। এখনও হল। আর সেই ফাঁকে তুলি তাকে টেনে পাশে বসাল। শোন জান, ওমর দেখতে অদ্ভুত সুন্দর একটি ছেলে। এত সুন্দর উচ্চারণে কথা বলে, এত সুন্দর গলার আওয়াজ। কি সুন্দর যে কবিতা আবৃত্তি করে! নরম, মায়াবী। কি যে ভদ্র, বিনয়ী! একজন মানুষের ভেতরে যে এতগুণ থাকতে পারে ওমরকে না দেখলে আমি তা বুঝতে পারতাম না। ওমরকে না দেখলে আমার যেন কিছুই দেখা হত না।

তুলির কথা শুনে খানিক আগের অভিমান মুহূর্তে ভুলে গেল শামা। তুলির গা ঘেষে বসে শিশুর মতো উৎসাহিত গলায় বলল, কোথায় পেলি? কি করে পেলি?

বাবা পাইয়ে দিয়েছেন।

মানে কি? তোর বিয়ে ঠিক হয়েছে? বাবা পাত্র এনেছে তার প্রেমে পড়েছিস?

আরে না।

তুলি তারপর পুরো ঘটনাটা খুলে বলল। কিছু বাদ দিল না। বাবাকে নিয়ে মজা করার ব্যাপারটিও বলল। সব শুনে শামা বলল, সে কি তোকে বলে ফেলেছে যে সে তোকে ভালবাসে!

না এত তাড়াতাড়ি কেউ বলে!

কোন কোন ছেলে বলে।

ওমর কোন কোন ছেলের মতো নয়। ওমর যদি খুব সাধারণ কোন ছেলে হত তাহলে ওর সঙ্গে আমার প্রেম হত না। ও রকম প্রেম করলে কত আগেই করতে পারতাম আমি।

কিন্তু সে তোর প্রেমে পড়েছে কিনা বুঝেছিস?

না, তবে আমি যে পড়েছি তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু একদিনের দেখায় তুই একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিস। ডেসক্রিপশান শুনে যা মনে হল তাতে এই ধরনের ছেলের খালি থাকার কথা নয়। হয়ত অন্য কারও সঙ্গে সে এনগেজড, হয়ত অন্য কারও সঙ্গে তার প্রেম আছে। কিংবা সে বিবাহিতও হতে পারে।

চোখ পাকিয়ে শামার দিকে তাকাল তুলি। অলক্ষুণে কথা বলবি না।

এটা অলক্ষুণে কথা নয়, এটাই বাস্তব।

আমি বাস্তব অবাস্তব বুঝি না। কাল সন্ধ্যেয় ওমরের কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, বিয়ের তো প্রশ্ন ওঠে না, কারও প্রেমেও সে এখনও পড়েনি। সে জন্মেছে আমার জন্য আর আমি জন্মেছি ওকে ভালবাসার জন্য। আমি আর কিছু বুঝি না।

এত ইমোশান ভাল না।

আমি ভাল মন্দ কিছু বুঝি না। আমি ওমরের প্রেমে পাগল হয়ে গেছি। আমি ওমরের জন্য মরে যাব।

তাহলে সরাসরি কথাটা তাকে বল।

কিভাবে বলব এটাই বুঝতে পারছি না।

শামা বেশ একটা লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলবি, দেখুন আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি, আমি আপনাকে ভালবাসি, এখন কি করবেন করেন।

তুলি গ্রীবা বাঁকা করে বলল, কি করবেন করেন মানে?

শামা খিলখিল করে হেসে উঠল। ইস তুই পারিসও। আরে গাধা আমি অন্য কিছু মিন করিনি। মানে আমি বোঝাতে চেয়েছি তুই তাকে বলবি আমি আপনাকে ভালবাসি, আপনিও আমাকে ভালবাসুন। তারপর আমরা বিয়ে করব। ব্যাস হয়ে গেল।

কিন্তু বললি এমন ভঙ্গিতে, ওই যে একটা জোক আছে না, না থাক ওই সব ভালগার জোক এখন বলব না। প্রেমের মতো সুন্দর একটি ব্যাপারের সঙ্গে ওইসব নোংরামোর কোন সম্পর্ক নেই। প্রেমে পড়ে আমি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছি।

মুখ এবং চোখ অন্যরকম করে শামার দিকে তাকাল তুলি। গম্ভীর গলায় বলল, তুই আসলে ঠিকই বলেছিস। সরাসরি কথাটা আমি ওমরকে বলব। ওর মুখ দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি ওর কোথাও কোন প্রেম নেই। ওর একমাত্র প্রেম ছিল ওর মা। তিনি মারা গেছেন।

শামা বলল, তাহলে আর দেরি করিস না। আজই বলবি। ওমর কি বলল আমাকে ফোনে জানাবি। আজই জানাবি। আমার স্বভাব জানিস, তুই যতক্ষণ সব না জানাবি আমি অস্থির হয়ে থাকব। তোর ফোন না পেলে আমার ঘুম আসবে না।

কিন্তু আজ বলা যাবে না। আজ স্কোপ পাব না। সন্ধ্যেবেলা বাবার সঙ্গে সে অফিস থেকে ফিরবে। আর বাবা বাড়ি থাকা মানে সারাক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে। একা ওমরের সঙ্গে গিয়ে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ওমর এখনও আমাদের তিনতলায় আসে না। সে থাকে দোতলায়। প্রয়োজন ছাড়া দোতলায় আমি নামতেই চাই না। এখন ঘনঘন গেলে সবাই বুঝে যাবে।

শামা চিন্তিত গলায় বলল, প্রতিদিনই তো সে তাহলে তোর বাবার সঙ্গে অফিস থেকে ফিরবে। ছুটির দিন ছাড়া তাহলে তুই কোন চান্স পাচ্ছিস না।

না পাব। আমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি। ওমরও ওঠে। আমার মা বাবা ঘুম থেকে ওঠে নটার দিকে। সকালবেলা ঘন্টা দু'য়েক অনায়াসেই ওমরের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারব।

তাহলে কাল সকালেই বলবি।

তাই বলব।

তোর কিন্তু বেশ সুবিধেই হল। বাড়িতে বসেই প্রেম। তিনতলা থেকে শুধু দোতলায় নামতে হবে, এটুকুই যা কষ্ট।

তুলি মজা করে বলল, আল্লায় যারে দেয় তারে ছাপ্পর ফাইড়া দেয়।

শামা বলল, ছাপ্পর মানে কি রে?

তুলি নির্বিকার গলায় বলল, জানি না। তবে আমার মনের অবস্থা এখন কেমন তোকে বলি। এই মুহূর্তে সব পারি আমি। ওমরের জন্য সব পারি। ওমরকে ছেড়ে ওমরের জন্যে মরেও যেতে পারি আমি।

তুলির কথাগুলো এত ভাল লাগল শামার, মুগ্ধ হয়ে তুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে। তুলি বলল, ছেলেবেলা থেকেই আমি একজন রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখতাম, জানিস। খুব ছোট বেলায় মা আমাকে রূপকথার গল্প বলত। কোনদিন দেখেনি, একেবারে অচেনা রাজপুত্রকে দেখেই রাজকন্যার মনে হত এ তো অচেনা নয়, এ তো তার জন্মজন্মান্তরের পরিচিত, জিয়নকাঠি মরণকাঠি সরিয়ে রাজপুত্র যখন ঘুম ভাঙ্গাত রাজকন্যার, চোখ মেলে গভীর মুগ্ধ চোখে সে রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকত। জীবন মরণ একাকার হয়ে যেত তার। মার মুখে এসব গল্প শুনতে শুনতে আমার কেবল মনে হত এমন করে এক রাজকুমার আসবে একদিন আমার জীবনে। আমারও সারা জীবনের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে সে। ঘুম ভাঙা চোখে আমি কেবল তাকে দেখব। কেবলই তাকে। কাল থেকে আমি আমাকে সেই রূপকথার রাজকন্যা ভাবতে শুরু করেছি। ওমর হচ্ছে আমার সেই রাজকুমার।

শামা তখনও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তুলির দিকে।

brommochari@yahoo.com

ছায়াপথের কুহেলিকায় তোমার নামের রেণু মাখা,
ম্লান মাধুরী ইন্দুলেখায় তোমার নামের তিলক আঁকা।
তোমার নামে হয়ে উদাস
ধুমল হলো বিমল আকাশ।
কাঁদে শীতের হিমেল বাতাস
কোথায় সুদূর নীহারিকা।

❒ কাজী নজরুল ইসলাম

ওমরের রুমের কাছে এসে অবাক হল তুলি। দরজা আধ ভেজান। ভেতরে গভীর সুন্দর গলায় কবিতা আবৃত্তি করছে ওমর।

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ় শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা পীড়িত ফুল
আনন্দ ভৈরবী।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিক কবিতা শুনল তুলি। তারপর ভেতরে ঢুকল। পূর্ব আকাশ উজ্জ্বল করে এই মাত্র সূর্য উঠেছে। পূর্ব দিককার খোলা জানালা দিয়ে ভোরবেলার কাঁচা রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। সেই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করছে ওমর। একটি শেষ হয়েছে, এখন তার কণ্ঠে অন্য কবিতা।

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি—ওই একটি পরমাদ ছিলো
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

তুলি বলল, কার কবিতা?

আকাশের দিক থেকে মুখ ফেরাল ওমর। তুলিকে দেখে অবাক হল। আপনি কখন এলেন? ওমরের চোখের দিকে তাকিয়ে তুলি আবার বলল, কার কবিতা?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আমার খুব প্রিয় কবি।

পরমাদ কথাটার মানে কি?

প্রমাদ। ভুল।

এ কিসের ভুল? এ কেমন ভুল?

ওমর হাসল, আপনার কি হয়েছে?

ওমরের আবৃত্তি শুনতে শুনতে কি রকম অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল তুলি। এবার নিজেকে সামলাল সে। মাথা নিচু করে বলল, কি যে হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কাল সন্ধ্যায়, না না, পরশু সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে কথা বলার পর, আপনি হেঁটে অফিসে গেছেন, নাশতা খাননি এসব শোনার পর রাতের বেলা একটুও ঘুমোতে পারিনি আমি। কি যে কষ্ট হয়েছে আমার! কাল সারাদিন কলেজে বসেও এসব কথা মনে হয়েছে। সন্ধ্যায় চেয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা হোক, হল না। মা বাবার সঙ্গে ছাদে বসে থাকতে হল। আজ সকালে এসে শুনি আপনি কবিতা আবৃত্তি করছেন। শুনে নিজেকে কি রকম অন্য মানুষ মনে হচ্ছে, নিজেকে আমি যেন ঠিক চিনতে পারছি না, যেন আমি এক অচেনা মানুষ। আমার এ রকম হচ্ছে কেন! এসবের মানে কি!

ওমর আবার হাসল। আপনি খুবই ইমোশনাল।

আপনি নন?

আমি আপনার চে বেশি। ইমোশনাল না হলে কেউ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে কবিতা পড়ে!

ইমোশনাল মানুষেরাই ভাল। ইমোশনাল না থাকলে সে আবার কিসের মানুষ!

তবে বেশি ইমোশন থাকা ভাল নয়। যারা খুব বেশি ইমোশনাল তারা খুব বেশি ভুল করে।

তুলি কাতর গলায় বলল, এসব শুনতে আমার ভাল্লাগছে না।

কি শুনবেন আপনি তাহলে!

জানি না।

আবৃত্তি করব! আমার আরেক প্রিয় কবির নাম হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বলেই আবার কি রকম হয়ে গেল ওমর। তুলির চোখের দিকে তাকিয়ে হৃদয় নিংড়ান আবেগে আবৃত্তি করতে লাগল,

যমুনা আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপে, এসো
স্বর্গ খুব দূরে নয়,

আবৃত্তি শেষ হওয়ার আগেই তুলি বলল, যমুনা কে?

ওমর একটু চমকাল। তারপর মৃদু হেসে বলল, যে কোন প্রেমিকা।

প্রেমিকা শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওমরের দিকে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল তুলি। মন্ত্রমুগ্ধের গলায় বলল, এই যে আমি হাত বাড়ালাম, আপনি হাত ধরুন।

ওমর একটু থতমত খেল। তারপর দু'হাতে তুলির বাড়িয়ে দেয়া হাতটি ধরল। কাতর গলায় বলল, এ তুমি কি করলে! এ তুমি কেন করলে!

এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আমি আর পারছিলাম না। এসবের জন্য আমি দায়ী নই, দায়ী তুমি। কেন আমার কথা শুনতে গিয়েছিলে তুমি! কেন আমার জন্য এত কষ্ট করলে। এই ঋণ এখন আমি কি করে শোধ করি! কেমন করে করি!

ওমর কথা বলতে পারল না। তুলির হাত ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন। যেন সে তুলির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছে পৃথিবীর সুন্দরতম এক স্বপ্ন। যে স্বপ্ন লক্ষ কোটি বছরে একবারই দেখে মানুষ। রাধার চোখের দিকে তাকিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিল কৃষ্ণ, লাইলির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল মজনু। শিশির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ফরহাদ, রজকিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল চণ্ডিদাস।

তুলি বলল, আমি তোমাকে যা বলতে চাই বলতে পারছি না।

ওমর বলল, কেন পারছ না!

আমি জানি না সে কথা কেমন করে বলতে হয়।

জানতে হয় না। যে যেমন করে বলে। বলবার আগে রাধা কি জানতেন কেমন করে বলতে হয় সে কথা! জানতেন না। লাইলি কি জানতেন! জানতেন না। তাঁরা যে যার মতো করে বলেছেন, যেমন করে ভেবেছেন, তেমন করে বলেছেন, বলার মুহূর্তে ওই কথাটি ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না তাঁদের হৃদয়ে। অন্য কোন ভাবনা ছিল না। তুমিও তেমন করে বল। যেমন করে ভেবেছ তেমন করে বল, ওকথা বলবার সময় তোমার হৃদয়ে যেন অন্য কোন কথা না থাকে। অন্য কোন ভাবনা না থাকে।

তুলি বলল, বহুদিন আগে আমি একটি জার্মান কথা শিখেছিলাম। ওই কথাটা বলব। অমন করে বলা কি ঠিক হবে!

হবে, তুমি বল।

ইক লিবেদিস।

মানে কি কথাটার?

ইংরেজিতে, আই লাভ ইউ।

ওমর ঘোর লাগা গলায় বলল, বাংলাটা আমি বলি?

বল।

আমি তোমাকে ভালবাসি।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুলির মনে হল রূপকথার সেই রাজকন্যার মতো মরণঘুমে এতকাল যেন ঘুমিয়েছিল সে। তার স্বপ্নের রাজকুমার এসে এই মাত্র তার সেই ঘুম ভাঙাল। মরণকাঠি সরিয়ে জিয়নকাঠির গভীর স্পর্শে ভরে দিল তার হৃদয়। এই প্রথম বেঁচে উঠল তুলি।

brommochari@yahoo.com

ভরে দেবে তোমার শূন্যতা এবং স্বেচ্ছায় এনে দেবে
চায়ের পেয়ালা, দূর করে দেবে মাথা ব্যথা
আর তুমি যা চাইবে তার সবটুকু দেবে।
তাকে কি করবে তুমি বিয়ে?

❒ সলভিয়া প্লাথ

আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙেছে আরজুর। হায়াত সাহেব গভীর ঘুমে। মোটা মানুষ বলে ঘুমিয়ে থাকলে নাক মুখে এক ধরনের শব্দ হয় তার। সকালবেলা এই শব্দটা আজ ভাল লাগল না আরজুর। তাঁর আরেকটা স্বভাব হচ্ছে একবার ঘুম ভেঙে গেলে কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। সুতরাং ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছেন তিনি। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এসেছেন। ভোরবেলার আকাশ কোন কোনদিন একটু বেশি সুন্দর হয়, হাওয়া হয় একটু বেশি আদুরে, আজকের ভোরটা তেমন। আরজু ভাবলেন খোলা ছাদে একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। কিন্তু ছাদের দিকে পা বাড়িয়েই থমকে গেলেন তিনি। তুলির ঘরের দরজা খোলা। কখনও কখনও সকালবেলা উঠে পড়তে বসে তুলি। গুনগুন করে পড়ে, বাইরে থেকে শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন তেমন কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দরজা ঠেলে তুলির ঘরে ঢুকলেন আরজু। ঢুকে অবাক হলেন। তুলি ঘরে নেই। বাথরুমেও যে নেই তা বোঝা গেল বাথরুমের দরজা খোলা দেখে। চশমাটা চোখের দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে আরজু মনে মনে বললেন, এত সকালে কোথায় গেল মেয়েটি!

তারপরই সেদিনকার কথা মনে হল আরজুর। সেদিন সকালবেলা দোতলায় নেমে গিয়েছিল তুলি। ওমরের সঙ্গে অযথা একটা ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েছিল। আজও তেমন কিছু হচ্ছে না তো! ওমরের সঙ্গে নতুন কোন ঝামেলা তৈরি করছে না তো তুলি! এইটুকু ভেবে আরজু একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলেন তিনি। ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকলেন। কিন্তু ড্রয়িংরুম ফাঁকা। সেখানে কেউ নেই। ব্যাপার কি! কোথায় গেল সব! ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে ওমরের রুমের দিকে এলেন আরজু। ওমর কি ঘুম থেকে উঠেছে! সে তো বেশ সকাল সকাল ওঠে!

ওমরের রুমের দরজা খোলা দেখে একটা শ্বাস ফেললেন আরজু। নিশ্চয়ই ওমর উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি চিন্তাও দেখা দিল আরজুর। তুলি কি তাহলে ওমরের রুমে! কেন? সকালবেলা এখনও বাড়ির কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। এ সময় এই বয়সী একটি

মেয়ে কেন এভাবে পালিয়ে আসবে উপযুক্ত বয়সের এক যুবকের রুমে!

নিঃশব্দে ওমরের রুমের সামনে এসে দাঁড়ালেন আরজু। ভেতরে তাকালেন। তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রুমের ভেতর পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে পাথরের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুলি আর ওমর। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না! বেঁচে আছে কি মরে গেছে, টের পাচ্ছে না।

সামান্য সময় এই দৃশ্য দেখে সরে গেলেন আরজু। তাঁর ইচ্ছে হল না তুলিকে ডাকেন, ওমরকে ডাকেন, দুজনকেই শাসন করেন। বরং তাঁর মনে হল এ এক অপূর্ব দৃশ্য। এ এক পবিত্র দৃশ্য। এই দৃশ্যের ভেতর আর যাই হোক, কোন পাপ নেই।

ভেঙো না হৃদয় প্রেমাস্পদের
কাচ দিয়ে গড়া সেই হৃদয়,
একবার যদি ভেঙে দাও তাকে
হাজার বছরে জোড়া লাগে না।

❒ ইউনুস এমরে

খুব বেশি অবাক হলে খানিক চুপ করে থাকেন হায়াত সাহেব। তারপর কথা বলেন। এখনও তেমন হল। আরজুর মুখ থেকে কথাগুলো শুনে এতটাই অবাক হলেন তিনি, কথা বলতে যেন ভুলেই গেলেন।

কথা শেষ করে নিজেও খানিক চুপ করে রইলেন আরজু, স্বামীকে সময় নেয়ার সুযোগ দিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায় হায়াত সাহেব তবু কথা বলেন না দেখে আরজু নিজেই স্তব্ধতা ভাঙলেন। কি হল! একেবারে যে বোবা হয়ে গেলে! কথা বলবে না! একটা কিছু বল।

হায়াত সাহেব আরজুর দিকে তাকালেন। কি বলব বল! কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সব তো জানলে এখন কোন একটা ডিসিসান দিতে হবে না!

কি ডিসিসান? ওমরকে এখান থেকে সরিয়ে দেব? চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেব?

শুনে আরজু একেবারে হা হা করে উঠলেন। কেন? না না, এমন করে বল না।

কেন বলব না বল। আমরা যার জন্য এতকিছু করলাম আমাদের সঙ্গে এই ধরনের বিট্রে করা তার ঠিক হয়নি।

কি বিট্রে করেছে ওমর?

এটা বিট্রে নয়! চেনা নেই জানা নেই একটি ছেলে বিজ্ঞাপন দেখে এসে চাকরি চাইল, ছেলেটিকে দেখতে ভাল, নরম বিনয়ী ভদ্র এজন্য তাকে চাকরি দিলাম, থাকার জায়গা নেই শুনে বাড়িতে আশ্রয় দিলাম। আর সে কিনা আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল! এটা তো অন্যায়। এটা তো বিট্রে করা। ওমর এটা ঠিক করেনি। তুমি ঠিকই বলেছিলে।

কি ঠিক বলেছিলাম আমি?

বাড়িতে কাউকে আশ্রয় দেয়ার আগে নিজের যে একটি উপযুক্ত মেয়ে আছে এই কথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল।

এখন আর আমি সেটা মনে করি না।

হায়াত সাহেব অবাক হলেন। কেন?

দোষটা ওমরের না তোমার মেয়ের তা তো আমরা জানি না। আমার মনে হয় তোমার মেয়েরই।

কেন আমার মেয়ের দোষ মনে হচ্ছে তোমার?

ওমরকে আমি যতটা দেখেছি, জেনেছি বুঝেছি তাতে আমার মনে হয় না সে নিজ থেকে তোমার মেয়ের দিকে এগিয়েছে। কারণ ওমর দেখতে শুনতে যেমন তোমার মেয়ে তার ধারে কাছেও নেই।

হায়াত সাহেব একটু বিরক্ত হলেন, এভাবে বল না। নিজের সন্তানের ব্যাপারে এভাবে বলতে হয় না।

আমি মিথ্যে বলিনি। তুমি ভেবে দেখ।

দেখেছি। আমার কাছে আমার মেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

আরজু হাসলেন। হয়েছে। আর বলবার দরকার নেই। এখন আসল কথা বল।

কি বলব কিছু বুঝতে পারছি না।

খানিক চুপ করে থেকে আরজু বললেন, ওমরকে আমার খুব পছন্দ।

তা আমি জানি। বেশ ভালভাবেই জানি।

তোমার পছন্দ নয়?

পছন্দ তো বটেই নয়ত দেখা মাত্র একটি ছেলেকে এভাবে কেউ চাকরি দেয় নাকি! তবে আমার চে ওমরকে যে তোমার বেশি পছন্দ, তাকে যে তুমি খুবই ভালবাস এটা আমি বুঝে ফেলেছি।

ঠিকই বুঝেছ তুমি। এরকম একটি ছেলেকে ভাল না বেসে পারা যায়! তাছাড়া মায়ের জন্য যে রকম ভালবাসা ওমরের, এরকম একটি ছেলে থাকা মানে যে কোন মায়ের নারী-জন্ম সার্থক। যে ছেলে তার মাকে এত ভালবাসে সেই ছেলে আর যাই হোক খারাপ ছেলে হতে পারে না। ওমরের মতো একটি ছেলে থাকলে এই পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাওয়ার থাকত না। ভাবা যায় এই ধরনের একটি ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে তার বাবা! ওই লোকটিকে আমার খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

একটু থেমে আরজু বললেন, ওমর চিরতরেই তাদের বাড়ি ছেড়ে এসেছে, বলেছে আর কখনও ওখানে ফিরে যাবে না। তোমারও একটি মাত্রই মেয়ে, তাকেও তুমি কখনও

চোখের আড়াল করতে চাইবে না।

মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকালেন হায়াত সাহেব। তার মানে কি? কি বলতে চাও তুমি।

তুমি বোঝনি আমি কি বলতে চাই!

বুঝেছি। তবুও তোমার মুখ থেকে পরিষ্কার করে শুনতে চাই।

যদি বুঝেই থাক আর শুনবার দরকার কি!

দরকার আছে। যা বলবার পরিষ্কার করে বল। আমি শুনব।

তোমার মেয়ে যেহেতু ওমরকে এতই পছন্দ করেছে, তোমার এবং আমারও তাকে পছন্দ, বিয়ের বয়সও তুলির হয়ে গেছে, ওমরের সঙ্গে তুলির বিয়ে দিয়ে দাও। ওমর বলেছে সে আর কখনও তাদের বাড়িতে ফিরে যাবে না, যাবার দরকার নেই। সে এই বাড়িতেই থাকবে।

ঘরজামাই হয়ে থাকবে?

ঘরজামাই শব্দটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। ঘরজামাই নয়। সে থাকবে আমাদের ছেলের মতো। আস্তে ধীরে ফার্মের কাজ পুরো শিখে ফেললে সে-ই ফার্ম চালাবে। তোমাকে আর এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

হায়াত সাহেব স্বস্তির একটা শ্বাস ফেললেন। হাসলেন। তোমার যা মত আমারও তাই মত। তোমার মতের বাইরে কখনও কি যাই আমি!

স্বামীকে হাসতে দেখে আরজুও হাসলেন। আমার মতটা খারাপ কি না বল।

না না খারাপ হবে কেন? খুবই ভাল মত তোমার। ওই যে একটা জোক আছে না?

হায়াত সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই আরজু বললেন, এখন আর জোক বল না। জোক বললে হাসতে শুরু করব, হাসির চোটে আসল ঘটনা চাপা পড়ে যাবে।

আসল ঘটনা যেন কোনটা?

এখন মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবছি। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। এখন অন্য কিছু বল না।

হায়াত সাহেব উদার গলায় বললেন, আমার ভাবতে খুব অবাক লাগে, সময় কিভাবে কেটে গেল। মনে হয় এই সেদিন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হল। তারপর তুলি হল। সেই তুলি কোন ফাঁকে বড় হয়ে গেল। এখন তার বিয়ে নিয়ে ভাবছি। প্রথমে স্বামী হলাম তারপর হলাম বাপ এখন হব শ্বশুর। এক দু'বছর পর হব নানা। আশ্চর্য! মানুষের জীবনটা কি রকম অদ্ভুত। সময় কিভাবে সবকিছু বদলে দেয়। আমার আজ মনে হচ্ছে চোখের পলকে দীর্ঘ একটা সময় আমার জীবন থেকে কেটে গেছে।

একটু থেমে হায়াত সাহেব বললেন, তবে তোমার ডিসিসানটা আমি খুব পছন্দ করেছি। এভারেজ মায়েদের মতো মেয়েকে প্রেম করতে দেখে ভালমন্দ না বুঝেই যে তুমি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করনি, আমি খুব খুশি হয়েছে। ছেলে কিংবা মেয়ে বড় হলে তাদের মন মেজাজ, রুচি এবং ভাল লাগা মন্দ লাগা মা বাবার বোঝা উচিত। সেসবের মূল্য দেয়া উচিত। আরেকটি বিষয়কে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাহল প্রেমিক প্রেমিকার মন কিংবা হৃদয় কখনও ভেঙে দেয়া উচিত নয়। না বুঝে অনেক মা বাবাই

brommochari@yahoo.com

তা করেন। ফলে ছেলে কিংবা মেয়েটির মনে এমন দাগ পড়ে কিংবা এমনভাবে ভেঙে যায় হৃদয়, সারা জীবনেও সেই ভাঙা হৃদয় আর জোড়া লাগে না। তবে আর একটি কাজ বোধহয় আমাদের করা উচিত।

কোন ফাঁকে চশমা নাকের ডগায় নেমে এসেছে আরজুর, চশমাটি ওপর দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, কি?

ওমরের ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নেয়া উচিত।

কি ধরনের খোঁজ খবর?

বিস্তারিত সবকিছু। সে যা যা বলেছে সবই ঠিক আছে, সব কিছুই আমার বিশ্বাস করেছি। ওর ব্যাপারে আমাদের কোন অবিশ্বাস নেই, সন্দেহ নেই। তবুও বিয়ে শাদীর ব্যাপার, গ্রামের বাড়ি, বংশ মর্যাদা ইত্যাদির একটু খোঁজ খবর নেয়া দরকার।

আমার মনে হয় কোন দরকার নেই। এসব আজকাল কোন ফ্যাক্টর নয়।

কিন্তু একেবারেই কোন খোঁজ খবর না নিয়ে একটি ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেব এও ঠিক নয়। এটা আমি মেনে নিতে পারছি না।

তুমিই বললে মন হৃদয় এসবের মূল্য দেয়া উচিত।

তার সঙ্গে খোঁজ খবর নেয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

নিশ্চয় আছে। তুমি যদি জান যে ওমর যা যা বলেছে তার কোনটিই সত্য নয়, লেখাপড়া ও যতদূর সে বলেছে ততদূর করেনি। তাহলে কি তুলির সঙ্গে তার বিয়ে দেবে না?

আমি তা বলিনি। আমি যা বলছি সেই ব্যাপারটি তুমি একটু বোঝার চেষ্টা কর। মা নেই কিন্তু বাবা ওমরের আছে। বাবা তাকে দেখতে পারুক বা না পারুক ছেলে যখন বিয়ে করবে, মেয়ের গার্জিয়ান হিসেবে আমাদের উচিত ছেলের গার্জিয়ানকে তা জানান। তাঁর মতামত নেয়া।

মতামত যদি তিনি না দিলেন!

সে তখন দেখা যাবে। শোন, আমি ভাবছি রায়বাবুকে একটু ময়মনসিংহ পাঠাব। রায়বাবু খুব বুদ্ধিমান লোক সে গোপনে সব খোঁজ খবর নিয়ে আসুক, কায়দা করে কথাবার্তা সব জেনে আসুক। তারপর প্রয়োজন হলে ওমরের বাবার কাছে আমরা লোক পাঠাব অথবা ওমরকে বলব কি করা যায় তুমি বল। তুমি যদি তোমার বাবাকে না জানাতে চাও তাহলে এক কথা আর যদি জানাতে চাও তাহলে কিভাবে জানাবে বল।

এটা খারাপ হয় না। ঠিক আছে দু'একদিনের মধ্যেই রায়বাবুকে তাহলে পাঠাও।

তবে কথাটা যেন ওমরের কানে না যায়। গেলে সে ভাববে আমরা তার কথা বিশ্বেস করিনি। তাকে ভুল বুঝেছি। যে ধরনের অভিমানী ছেলে ওসব জানলে খারাপ হবে। অভিমান করে চলেও যেতে পারে।

বাড়ি থেকে এসব কথা ওমরের কানে যাওয়ার কোন কারণ নেই। তোমার অফিস থেকে না গেলেই হল।

অফিস থেকে যাবে না। জানব তো শুধু রায়বাবু আর আমি। রায়বাবু আমার পুরনো লোক। আমি মানা করেছি, মরে গেলেও সে কথা সে কাউকে বলবে না।

আরজু চুপ করে রইলেন।

হায়াত সাহেব বললেন, আচ্ছা শোন, ওমরের সঙ্গে তুলির বিয়ের ব্যাপারে যে আমরা ভাবছি এ কথা যেন তুলির কানে না যায়। এবং তুলির সঙ্গে ওমরের ব্যাপারটা যে তুমি আমি জেনেছি এ কথাও যেন সে না জানে। যেমন চলছে সব ঠিক এভাবেই চলবে।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আরজু বললেন, আমি বলব না। মেয়ের সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক তুমিই নিজেই না কবে বলে ফেল।

হায়াত সাহেব হাসলেন, না বলব না। এসব বলবার প্রশ্নই ওঠে না।

তাল সুপারি গাছের নিচে, সন্ধ্যা নদীর উদাস তীরে,
শান বাঁধানো পথে পথে, বাস ডিপোতে, টার্মিনালে,
কেমন একটা গন্ধ ঘোরে।

❒ শামসুর রাহমান

সন্ধ্যের মুখে মুখে ছাদে বসেছে সবাই। আজ প্রথম ওমরকেও ডেকে আনা হয়েছে। হায়াত সাহেব আরজু তুলি এবং ওমর বেতের গোল টেবিলটির চারপাশে বসেছে। ওমর একটু আড়ষ্ট হয়ে ছিল। মাথা নিচু করে বসে আছে সে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। টেবিলের ওপর বিকেলের নাশতা এনে সাজিয়ে রাখছে বুয়া। নাশতার পরিমাণ আজ একটু বেশি। কেক বিসকিট চানাচুর মিষ্টি শামি কাবাব। তুলি বুঝতে পারছিল ওমরকে তাদের সঙ্গে বসে নাশতা খেতে ডাকা হয়েছে বলে এই আয়োজন। এটা তার খুব ভাল লাগছিল। তার ভালবাসার মানুষকে মা বাবা যতটা যত্ন করবে, যত স্নেহ মমতা এবং ভালবাসা দেবে তুলির মনে হবে সেই যত্ন, স্নেহ মমতা এবং ভালবাসা যেন তাকেই দেয়া হচ্ছে। ভালবাসার মানুষের জন্য এই অনুভূতিই তো হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষের। কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না কেন! সবাই এমন চুপচাপ হয়ে আছে কেন! হায়াত সাহেব প্রথমে তুলির দিকে তাকালেন তারপর আরজুর দিকে। কি ব্যাপার কেউ কোন কথা বলছ না কেন?

আরজু বললেন, কি বলব!

বিকেলের চা নাশতা খেতে বসে কেউ এমন গম্ভীর হয়ে থাকে! তাছাড়া ওমর আজ প্রথম তিনতলায় উঠল, তার অনারে বেশ ভাল ভাল নাশতার আয়োজন করেছ তুমি, কিন্তু রয়েছ গম্ভীর হয়ে। মানে কি এসবের?

আরজু একটু নড়েচড়ে উঠলেন তারপর কোয়ার্টার প্লেটে নাশতা তুলে ওমরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। নাও।

ওমর লাজুক ভঙ্গিতে প্লেট নিল। ওমরের এই ভঙ্গিটি খেয়াল করলেন হায়াত সাহেব। বললেন, তুমি এরকম আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন ওমর? আরাম করে বস। এখানে তো বাইরের কেউ নেই, আমরাই। আমাদেরকে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন তুমি!

হায়াত সাহেবের কথা ধরে আরজু বললেন, তুমি এখন এই বাড়িরই ছেলে। নিজের বাড়ির মতো করে থাকবে, আমাদের কাছে আড়ষ্ট হয়ে থাকবার কোন মানে নেই। লজ্জা পাবার কোন মানে নেই।

তারপর একটু থেমে বললেন, খাও।

চামচে কেটে শামি কাবাবের ছোট্ট একটু টুকরো মুখে দিল ওমর। তবে আগের মতোই মাথা নিচু করে। হায়াত সাহেবও খেতে শুরু করেছেন। নিজের প্লেট নিয়ে বিসকিট মুখে দিতে যাবেন আরজু হঠাৎ করে তুলির দিকে চোখ পড়ল। তুলি কিছুই নেয়নি। কি রকম মুখ করে বসে আছে। আরজু খুবই অবাক হলেন। কিরে তোর আবার কি হল?

তুলি মুখ গোঁজ করে বলল, কিছু না।

খাচ্ছিস না কেন?

তুমি আমাকে তুলে দিলে না কেন?

তুলে দিতে হবে কেন! তুই তোরটা নিয়ে নে।

না আমি নেব না। তুমি সবার প্লেটে খাবার তুলে দিলে আমাকে দিলে না কেন? আমি কি কেউ নই!

হায়াত সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, রাইট। সবাইকে দিয়েছ ওকে দাওনি কেন? ওকি তোমার মেয়ে নয়?

নিজের প্লেট নামিয়ে রেখে হাসি মুখে তুলির জন্য একটা প্লেট সাজালেন আরজু। তুলির হাতে তুলে দিলেন। নে এবার খা। নাকি খাইয়ে দিতে হবে?

তুলি বলল, না অতটা করতে হবে না। এইটুকু যে করলে এই যথেষ্ট।

তারপর কেক ভেঙে মুখে দিল।

হায়াত সাহেব আবার তাকালেন ওমরের দিকে। ওমরের প্লেটে বেশির ভাগ খাবারই রয়ে গেছে। প্রায় কিছুই সে খায়নি। দেখে বললেন, কি হল, তুমি খাচ্ছ না ওমর?

এই প্রথম কথা বলল ওমর। জ্বী খাচ্ছি।

কই সবই তো রয়ে গেছে। এই দেখ আমার প্লেট। প্রায় খালি। আর দুটো কাবাব নেব ভাবছি। অবশ্য বলা যায় না, দুটোর বেশিও নিতে পারি।

তুলি বলল, তা তুমি নাও। কিন্তু সবাই তোমার মতো পেটুক নয় যে যা পাবে হামলে পড়ে খেয়ে নেবে।

হায়াত সাহেব বোকার মতো মুখ করে তাকালেন। কেন?

নিজের শরীরের কথা একবার ভাব।

শরীরের কথা ভেবেই তো নিচ্ছি।

মানে?

দাঁড়াও নিয়ে নিই তারপর বলছি।

দুটো শামি কাবাব নিজের প্লেটে তুললেন হায়াত সাহেব। খুবই সরল এবং নির্বিকার

গলায় বললেন, শরীর অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। এটা বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু কোন কোন সময় শরীর চাইলেও সেই অনুযায়ী খাদ্য নিতে হয় না। কন্ট্রোল করতে হয়। তোমার মতো মোটা মানুষের তো না খেয়েই থাকা উচিত। যত না খেয়ে থাকবে, যত কন্ট্রোল করবে তত কম রোগ হবে, তত বেশিদিন বাঁচবে।

হ্যাঁ ডাক্তারও তাই বলেছেন

তাহলে?

আমার অবস্থা হয়েছে সেই সিগ্রেট খোরের মতো। ডাক্তার বলেছেন আপনার হার্টের অবস্থা ঘোরতর খারাপ, দিনে দু'প্যাকেট করে সিগ্রেট খান, যদি বাঁচতে চান এটা বাদ দিতে হবে। রোগী কাতর গলায় বলল, বাঁচতে আমি চাই, তবে সিগ্রেট ছাড়া বাঁচতে চাই না।

এইটুকু বলেই তিনজন মানুষের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন হায়াত সাহেব। তোমরা কেউ যে হাসলে না?

তুলি নির্বিকার গলায় বলল, এতে হাসির কিছুই নেই, হাসব কেন?

কিন্তু এই জোকটার এইটুকু শুনেই লোকে হাসে। মনে করে শেষ হয়ে গেছে।

আরজু বললেন, আমরা মনে করছি না। তুমি শেষ কর।

দ্বিতীয় শামি কাবাবটা শেষ করে হায়াত সাহেব বললেন, শুনে ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে একবারে যখন ছাড়তে পারবেন না তাহলে দিনে একটা সিগ্রেট খাবেন। রোগী খুশি হয়ে গেল। তবে ঠিক আছে। তবে বাঁচতে আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আর একটা কথা আমি ব্যবসায়ী মানুষ, সারাক্ষণ অফিসে বসে থাকতে হয়, একদমই বেরুবার সময় পাই না। আপনি মাঝে মাঝে আমার অফিসে গিয়ে আমাকে একটু দেখে আসবেন। আপনাকে আমি ডাবল ভিজিট দিয়ে দেব। ডাক্তার খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোন অসুবিধা নেই। যাব।

তুলি ঠোঁট উল্টে বলল, এত লম্বা জোক জমে না।

তারপর নিজের প্লেট নামিয়ে রাখল। পানি খেল। জোক ছোট না হলে ভাল্লাগে না।

তোর ভাল লাগবার দরকার নেই। আমি তোকে বলছিনা।

হায়াত সাহেব ওমরের দিকে তাকালেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ওমর। দেখে তিনি বললেন, তোমার ভাল লাগছে?

জ্বী লাগছে। খুব ভাল লাগছে। আমি জোক খুব পছন্দ করি।

তাহলে বলি। তিনজনের একজন শুনলেই হয়। তুমি পছন্দ কর তুমি নিশ্চয়ই শুনবে।

আরজু তখন প্রতিটি কাপে চা ঢালছেন। সেই অবস্থায় বললেন, আমিও শুনছি। তুমি বলে যাও। তুলির কথায় কান দিও না।

হায়াত সাহেব অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তুমি শুনছ আমার জোক! বল কি! জীবনে এই প্রথম শুনতে দেখছি।

আজ আমার ভাল লাগছে বলে শুনছি। আগে কখনও ভাল লাগেনি, শুনিনি।

আজ হঠাৎ করে সবকিছু এমন ভাল লাগতে শুরু করল কেন তোমার?

brommochari@yahoo.com

আরজু কথা বলবার আগেই তুলি বলল, আহ বাবা! জোকটা শেষ কর।
এই যে বললি ভাল লাগছে না আবার বলছিস শেষ করতে। আমি তো খুব বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিরে! তোদের কারও কিছুই আজ বুঝতে পারছি না।
আমার ভাল লাগছে না, কিন্তু এখানে শুধু আমি নেই। আর যারা আছে তাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগছে। তারা তোমার জোক শুনছে। তুমি বল।
আর যারা মানে!
তারপরই ভীষণ অবাক হওয়ার ভান করলেন হায়াত সাহেব। এই তুলি ওমরের সঙ্গে তোর পরিচয় নেই! একবারও কথা বলতে দেখলাম না। পরিচয় না থাকলে বল পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। একি কথা! এক সঙ্গে বসে নাশতা করছিস, আড্ডা দিচ্ছিস কিন্তু কে কাউকে চিনছিস না! না না এটা ঠিক নয়।
সব কথা শুনে ওমর মাথা নিচু করল। আড়চোখে তাকে একবার দেখে তুলি আরজুর দিকে তাকাল। মা তুমি একটু বাবাকে সামলাও। কি শুরু করেছে!
হায়াত সাহেব ঠা ঠা করে হাসলেন। ঠিক আছে জোকটা শোন। ক'দিন পর ডাক্তার গেছেন সেই রোগীর অফিসে। গিয়ে দেখেন রোগী তার চেয়ারে বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে, তার ঠোঁটে বিশাল লম্বা এক সিগ্রেট জ্বলছে। টেবিল ছাড়িয়েও অনেক দূর চলে গেছে সেই সিগ্রেট, এত লম্বা। ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার এত বড় সিগ্রেট? রোগী নির্বিকার গলায় বলল, আপনি বলেছেন একটা সিগ্রেট খেতে হবে এজন্য আমি দু'প্যাকেটের চল্লিশটা সিগ্রেট জোড়া দিয়ে একটা বানিয়ে নিয়েছি।
জোক শুনে ওমর মাথা নিচু করে হাসতে লাগল। তুলি হাসতে লাগল খিলখিল করে। সেই ফাঁকে আর একটা শামি কাবাব নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন হায়াত সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে সেই হাত চেপে ধরলেন আরজু। আর না! অনেক হয়েছে। সীমা ছাড়িয়ে যেও না।
হায়াত সাহেব বললেন, মনে কর সবগুলো শামি কাবাব মিলিয়ে আসলে একটা। ওই সিগ্রেটের মতো।
তুলি এবং ওমর আবার হাসল।
আরজু বললেন, তুমি এখন চা খাও। খাও তো।
তারপর চিনি ছাড়া চায়ের কাপ ধরিয়ে দিলেন হায়াত সাহেবের হাতে। চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, এবার ছোট জোক। শিক্ষক, কোন যুদ্ধে নেলসন মারা যান? ছাত্র, তার জীবনের শেষ যুদ্ধে স্যার।
এতক্ষণে ওমর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। বেশ স্বাভাবিকভাবে হাসছে সে। হায়াত সাহেব একবার ওমরের দিকে তাকালেন। তারপর আরজুর দিকে তাকিয়ে বললেন- যাদুঘরে দুটো মাথার খুলি পাশাপাশি রাখা, দুই বন্ধু ঢুকেছে সেখানে। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, বড় খুলিটা কার রে? অন্যজন বলল, সম্রাট অশোকের। আর ছোটটি? ওটিও অশোক সাহেবেরই। তবে ছেলেবেলার।
তুলি এবং ওমর দু'জনেই বেশ জোরে হাসল। আরজুও হাসলেন। এটি বেশ মজার জোক। দারুণ জমেছে। একই লোকের যে দুটো মাথার খুলি হতে পারে জীবনে প্রথম শুনলাম।
ঠিক তখুনি বুয়া এসে দাঁড়াল সামনে। রায়বাবু আসছেন।

রায়বাবুর কথা শুনে হঠাৎ করে বেশ ব্যস্ত হয়ে গেলেন হায়াত সাহেব। তাই তো, রায়বাবুর তো আজ আসার কথা। তাকে একটা কাজে পাঠিয়ে ছিলাম আমি।
হায়াত সাহেব উঠলেন। আরজুর দিকে তাকালেন। তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো তো রায়বাবুর সঙ্গে খুব জরুরি একটি বিষয়ে কথা বলব। তোমারও সঙ্গে থাকা দরকার।
বাবার আচরণে তুলি বেশ অবাক হল। ওমরও কম অবাক হয়নি। তারা দুজনেই হায়াত সাহেবের দিকে তাকাল। হায়াত সাহেব মুহূর্তের জন্যে ওদের দিকে তাকালেন। তোমরা বসে গল্প কর, আমরা দু'জন একটু নিচে যাই। আমাদের জরুরি একটা কাজ আছে।
তাঁরা দু'জন সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন। তুলি কান পেতে ছিল কখন পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যেতেই ওমরের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। দেখেছ আমার মা বাবা কেমন স্মার্ট। আমাদের দু'জনকে সুযোগ দিয়ে চলে গেলেন।
ওমর তখন কি রকম আনমনা হয়ে আছে, চিন্তিত হয়ে আছে। তুলি কথায় তার দিকে তাকাল। আমাদের ব্যাপারটা টের পেয়েছেন নাকি!
কে জানে! পেলে পেয়েছেন, কিছু করার নেই। দু'দিন আগে পরে তাঁরা তো সব জানবেনই। আগে ভাগে জেনে যাওয়াই ভাল।
না ভাল না।
কেন?
তাঁরা আমাকে খারাপ ভাববেন।
তোমাকে কেন খারাপ ভাববেন। আমি আছি না! আমি সরাসরি বলব ওর কোন দোষ নেই। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে সে আমার। আমিই প্রথম ওকে ভালবেসেছি। ও এত সুন্দর, এত ভাল। আর আমি! আমার মতো মেয়েকে ও ভালবাসতে যাবে কেন! আমিই ভালবেসেছি ওকে।
মুগ্ধ হয়ে তুলির চোখের দিকে তাকাল ওমর। তুলির একটা হাত ধরল। তুমি খুব ভাল মেয়ে তুলি। তোমার মতো মেয়ের প্রেম যে পুরুষের কপালে জোটে তারচে ভাগ্যবান পুরুষ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। শুধু চেহারা, গায়ের রঙ, ফিগার এসব দিয়েই মানুষ সুন্দর হয় না। মানুষের সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার মনের ভেতর। মনের সৌন্দর্যের শক্তি এত প্রখর, সেই সৌন্দর্যের আলো এত তীব্র সেই আলোয় চেহারা গায়ের রঙ ফিগার এসব অপূর্ব সুন্দর হয়ে যায়। মনের দিক দিয়ে তুমি এক অসাধারণ সুন্দর মেয়ে। তোমার চেহারা ইত্যাদি নিয়ে যারা কথা বলবে তারা মূর্খ।
বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওমর। তারপর তুলির হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যাই।
ওমরের কথা শুনতে শুনতে কোন অচিনলোকে যেন হারিয়ে গিয়েছিল তুলি। ওমরকে উঠে দাঁড়াতে দেখে তুলিও উঠল। কোথায়?
জানি না।
তুলি একটু চমকাল। মানে?
ওমর হেসে বলল, নিচে রায়বাবু এসেছেন তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করি। দু'তিন দিন তিনি অফিসে ছিলেন না। দু'তিন দিন দেখা হয়নি তো! তাঁর কাছে যাই।
ওমর আর কথা বলল না। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে ওমরকে দেখে

বুকটা হঠাৎ করে কেমন শূন্য হয়ে গেল তুলির। কেন যে এমন হল!

বেলাভূমির গাছের শাখায়
দুটো উদোম পায়রা চোখ কেড়েছিল আমার।
ওরা দু'জনে এ ওর,
আবার, দু'জনে কেউ কারো নয়।

❒ ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা।

হায়াত সাহেব ফ্যালফ্যাল করে রায়বাবুর দিকে তাকালেন। কি বলছেন! এ কি করে সম্ভব? এ কেমন করে সম্ভব!

রায়বাবু ম্লান কণ্ঠে বললেন, আমারও মাথায় ঢোকেনা এ কি করে সম্ভব। যে বাড়ির কথা বলেছে ওমর, ঠিক সেই জায়গায় সেই বাড়িটি আছে। বাবার নাম যা বলছে সেই নামে লোকও আছে। রাজনীতি করেন। অসম্ভব ভাল লোক। প্রচুর টাকার মালিক। যেমন টাকা আছে তেমন দানও করেন। লোকে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অবিরাম লোকজন আসছে বাড়িতে। এর অমুক সমস্যা অমুকের তমুক সমস্যা। কেউ খাবার পাচ্ছে না কেউ চাকরি পাচ্ছে না, কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, কেউ স্বামী সন্তানের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইছে, আমি নিজে বসে থেকে দেখলাম কাউকে বিমুখ করছেন না তিনি। হাসিমুখে প্রত্যেকের কথা শুনছেন। সাহায্য করছেন। দুই ছেলে দুই মেয়ে ভদ্রলোকের। আমি ঢাকা থেকে গিয়েছি শুনে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। আমি অবশ্য এসব বলিনি। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোজাফফর সাহেবের কাছে গিয়েছি আগেই তার কাছে জেনে গিয়েছিলাম ওমর ফারুখ নামে মোজাফফর সাহেবের কোন ছেলে নেই। তখনই খটকাটা লেগেছে আমার। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমি সব জেনে ফেলেছিলাম। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম হাতে নাতে প্রমাণ করার জন্য। অবশ্য অন্য একটা অজুহাতও ছিল। বলেছি ময়মনসিংহ শহরে আমার একটা জায়গা আছে, জায়গাটি অন্য এক লোক দখল করে রেখেছে। আপনি সাহায্য করলে জায়গাটি আমি পেতে পারি। আমি গরিব মানুষ, আপনি সাহায্য করলে উপকৃত হই। তিনি বললেন, আমি নিশ্চয় আপনার কাজ করে দেব।

ঠিক এসময় ড্রয়িংরুমের দরজার বাইরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ওমর। ঘরের ভেতর কি কথা হচ্ছে শোনার জন্য কান পাতল।

আরজু বললেন, আমি বিশ্বেস করতে পারছি না। এ আমি বিশ্বেস করতে পারছি না। আপনি ঠিক খবর নিয়েছেন তো?

রায়বাবু নরম গলায় বললেন, আমি কোন কাজ অসম্পূর্ণভাবে করিনি। ময়মনসিংহ শহরের প্রচুর লোকজনের কাছে চৌধুরী সাহেব সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছি। ওমর যা যা বলেছে তা বিন্দুমাত্রও সত্য নয়। একদমই মিথ্যে। একদমই বানোয়াট। চৌধুরী সাহেবের কোন স্ত্রী ওভাবে মারা যাননি। তাঁর একটিই স্ত্রী এবং তিনি জীবিত। ওমরের মতো কোন ছেলেও নেই তাঁর। যারা আছে তাদের আমি দেখেছি। নানা রকমভাবে আসল তথ্য আমি জেনেছি।

হায়াত সাহেব বললেন, তার মানে এই দাঁড়াল অমন একজন বিখ্যাত লোকের ছেলে হিসেবে পরিচয় দিয়ে, মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে করুণ একটি গল্প তৈরি করে, নিজের সুন্দর চেহারা, নম্র বিনয়ী ব্যবহার দিয়ে আমাদেরকে মুগ্ধ করে আমাদের ওপর বিশাল একটি সুযোগ নিয়েছে সে। দুর্দান্ত পাকা অভিনেতার মতো কাজটা করেছে। ছি!

রায়বাবু বললেন, ওমরের সবচে বড় অস্ত্র ওর সারল্য। যে কোন কথা এত সরলভাবে বলে, যে কোন লোকই ওর কথা শুনে বিভ্রান্ত হবে। আমরা সবাই তা হয়েছি।

হায়াত সাহেব এবং রায়বাবুর কথা শুনতে শুনতে আরজুর ততক্ষণে গলা প্রায় বুজে এসেছে। জড়ান গলায় তিনি বললেন, আমার তুলির এখন কি হবে! এতবড় কষ্ট সে সামলাবে কি করে! জীবনের শুরুতেই এমন একটি হোচট খেল আমার মেয়ে। এ কি হল! তারপর নিজের কাছে বলার মতো করে বললেন, আজ বিকেলে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে কি যে ভাল লেগেছিল আমার! কি যে সুন্দর মানিয়েছিল দু'জনকে! তখন কি একবারও আমি ভেবেছি খানিক পরই এই ধরনের কথা শুনতে হবে আমাকে! এতবড় একটি দুঃখ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। ওরা দু'জন যে কেউ কারও নয়। একথা আমি কেমন করে ভাবব! ওমর কেন এমন হল—ওমর কেন এমন করল! সে দেখতে ভাল ভদ্র। ব্যবহারের কোন তুলনা হয় না। সুন্দরভাবে কথা বলে, অপূর্ব উচ্চারণ ওমরের। যতটা বলেছে ততটা না হলেও শিক্ষিত তো সে অবশ্যই। ওর জন্য এই যোগ্যতাই তো যথেষ্ট ছিল। ওর বাবা বড়লোক কি গরিব তাতে আমাদের কি আসত যেত। আমরা তো ওর বাবাকে দেখিনি, আমরা দেখেছি ওকে। ওর বাড়ি ময়মনসিংহ না হয়ে অন্য যে কোন জায়গায় হলেই বা কি। আমরা কি ওদের বাড়ি ঘর দেখতে চেয়েছি! কেন সে মাকে নিয়ে ওই ধরনের নির্মম একটি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলল আমাকে। মা বেঁচে থাকলেই বা আমাদের অসুবিধা কি! হয়ত অত্যন্ত দীন দরিদ্র ঘরের ছেলে সে, হয়ত মা বাবা অবশ্যই আছে ওর, হয়ত অনেকগুলো ভাই বোন ওরা, হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য ঢাকায় এসেছে সে, এ সব সত্য আমাদের কাছে লুকিয়ে কি লাভ হল ওর! ওরকম বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে আমাদের সহানুভূতি ওকে আদায় করতে হবে কেন! সত্য কথাই যদি সে আমাদেরকে বলতো আমরা কি ওকে কম ভালবাসতাম! এখন যেটুকু ওর জন্য করেছি তখনও কি এই করতাম না! ও তো একটি বোকা! ও তো ভুল করেছে। এ তো বেঁচে থাকার কোন পদ্ধতি হতে পারে না। এ ভুল পদ্ধতি, এ ভুল জীবন ওমরের মতো শিক্ষিত স্মার্ট একটি ছেলে এই ধরনের ভুল পথ কেন বেছে নিল!

কথা বলতে বলতে মাথা নিচু করে চোখের জল সামলাতে লাগলেন তিনি।

ওমর তখন দ্রুত পায়ে নিজের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় অঝোর দুঃখে বাতাসের হাহাকার,
বিরাট আকাশের একটি শূন্য হৃদয়,
পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে বেড়ায় হিমেল বাদল রাতে
মেঘের আড়ালে বিধবা আলোয় হাতড়িয়ে যায়,
বৃথা খুঁজে মরে, মাঠে মাঠে কান পাতে,
সান্ত্বনা নেই তার।

❐ বিষ্ণু দে

তুমি মনে মনে বলল, এ সত্য নয়, এ মিথ্যে। ওমর এমন হতে পারে না। ওমর মিথ্যে বলতে পারে না। অমন দেবতার মতো মানুষ কি করে বলে এত মিথ্যে কথা! কেমন করে এমন মিথ্যাচার করে। আমি বিশ্বেস করি না। আমি এসব বিশ্বেস করি না। আমি এখুনি ছুটে যাব ওমরের কাছে। গিয়ে তার দু'হাত জড়িয়ে বলব, তোমার সব কিছু যদি মিথ্যে হয় হোক, আমার কিছু যায় আসে না, তুমি শুধু বল তোমার ভালবাসা সত্যি। আমাকে যে তুমি ভালবাস এ চিরসত্যি। আকাশের সূর্য তারার মতো সত্যি। তোমার ভালবাসার কোন মিথ্যাচার নেই। শুধু ওটুকুই জানলেই হবে আমার। আমি আর কিছু জানতে চাই না। তোমার কিচ্ছু না থাক আমার শুধু তুমি থাকলেই হবে। তোমার পিতা আছে কি নেই আমার জানবার দরকার নেই। যদি অনেকগুলো ভাইবোন থাকে তোমার কিংবা একজনও না থাকে আমার তাতে কি। আমি তো শুধু তোমাকে চাই, তোমাকে। আমি তো শুধু তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে। আমার ভালবাসায় কোন খাদ নেই, ভুল নেই। ভালবাসা ভালবাসাই। ভালবাসা কখনও ভুল হতে পারে না। কেউ যদি বলে তোমাকে ভালবেসে আমি ভুল করেছি আমি তা মানি না।

পাগলের মতো ছুটে এসে ওমরের ঘরে ঢুকল তুলি। ঢুকে পাথর হয়ে গেল। ঘর শূন্য। ঘরের কোথাও নেই ওমরের বিন্দুমাত্র চিহ্ন। যে আলনায় থাকত ওমরের জামাকাপড় সেই আলনা এখন শূন্য। যেখানে থাকত জুতো সেই জায়গাটা শূন্য। খাটের তলায় থাকত কালো ব্যাগ, ব্যাগটা সেখানে নেই।

মৃত্যুর মতো চারদিক তাকিয়ে এই শূন্যতারই যেন হাত ধরল তুলি। তারপর সর্বস্ব হারান মানুষের মতো খোলা জানালাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশের দিকে তাকাল। সন্ধ্যে রাতেই আজ চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ম্লান এক টুকরো আলো এসে পড়েছে এই ঘরের জানালায়। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে নিঝুম হয়ে কাঁদতে লাগল তুলি। ভালবাসার জন্য জীবনে এই তার প্রথম কান্না।

brommochari@yahoo.com
mayakanon@hotmail.com
silkilasilki@gmail.com